বাংলা ছোটগল্প

শারদীয়
১৩৮৩

Eveready offers the lowest priced leakproof battery in India!

New!

SILVER

EVEREADY®

LEAKPROOF

BATTERY

UC 8766A-

বাংলা ছোটগল্প

শারদীয় ১৩৮৩ ॥ সূচীপত্র

প্রবন্ধ

উজ্জ্বল মজুমদার ॥ ছোটগল্প : একমুখী লক্ষ্যে ॥ ২২

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী ॥ বিমল কর : দুটি গল্পের দর্পণে ॥ ৫৯

নিত্যপ্রিয় ঘোষ ॥ কবিতা সিংহের গল্পের জগৎ ॥ ১৪২

অনুবাদ

ডিলান টমাস ॥ অন্তর্বাস ॥ স্নেহাকর ভট্টাচার্য ॥ ৬৫

গল্প

মহাশ্বেতা দেবী ॥ আশা ॥ ১৭

কবিতা সিংহ ॥ বিষ-স্মরণ ২৮

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ॥ শ্বেতী ॥ ৩৯

দিলীপ সেন ॥ রঙমহল ॥ ৪৫

অমিয় রায়চৌধুরী ॥ রক্তের ঋণ ॥ ৬৯

কালীকুমার চক্রবর্তী ॥ এই খেলা খেলতে ॥ ৭৫

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী ॥ নক্ষত্র ॥ ৮৩

অরুণ চট্টোপাধ্যায় ॥ ফুলে ঘ্রাণ ছিল ॥ ৯৪

সত্যেন্দ্র আচার্য ॥ সপা ॥ ১০০

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ তিন কূল ॥ ১০৪

দিলীপ ঘোষ ॥ সে ॥ ১১২

তৃপ্তি বসু ॥ কর্ণেল সাহেবের স্ত্রী ॥ ১১৪

শিশির গুহ ॥ কবরখানা ॥ ১২২

চন্দ্রচূড় সরকার ॥ অন্তরঙ্গ ॥ ১২৫

সমীর রক্ষিত ॥ আঠারো বছর বয়সের মৃত্যু ॥ ১৩৩

অহর সেনগুপ্ত ॥ বেওয়ারিশ, আমি ও মৃতদেহের বিচার ॥ ১৩৮

স্বদেশরঞ্জন দত্ত ॥ অসভ্য ১৪৮

প্রচ্ছদ ॥ স্বপন মণ্ডল

সম্পাদক : স্বদেশরঞ্জন দত্ত সহযোগী সম্পাদক : অমিয় রায়চৌধুরী

কার্যালয় ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০ দাম ॥ তিন টাকা

উৎসবের দিনগুলিতে—

খুশীর রঙে মেতে উঠতে

এন, টি, সি-র কাপড় কিনুন।

আমাদের ১৪/১০ গড়িয়াহাটা রোডের শো-রুমে ধুতি * শাড়ী * সুটিং শার্টিং—সবই পাবেন। আরও পাবেন বাংলার বাছাই করা তাঁতের কাপড় ও রং-বেরঙের রেডিমেড পোষাক।

কলকাতা ও আশপাশের সমবায়িকা এবং সমবায় ভাণ্ডারগুলোতেও এন, টি, সি-র কাপড় পাওয়া যাচ্ছে।

এন, টি, সি-র কাপড়—শুধু সস্তা বা টেকসই বলেই নয়, বাহারেও এর জুড়ি নেই।

ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশন

(পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা) লিঃ

৭, জহরলাল নেহরু রোড, কলিকাতা ৭০০০১৩

আমাদের নিজস্ব ডিলার :

জাতীবাগান : কে. এল. দত্ত এণ্ড কোং

ব্যারাকপুর : লাকি ভ্যারাইটি ডাইং

বেলেঘাটা : লক্ষ্মী গ্রুপ ট্রেডিং কোং (সরকার বাজার)

শিবড়া : রামগোপাল কেডিয়া (বাজারের নিকট)

বেহালা : ঘোষ এণ্ড সন্স (সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটির নিকট)

দুর্গাপুর : ডি, এস, পি, এমপ্লইজ (বেনাচিতি) কো-অপ সোসাইটি লিঃ

গড়িয়া (বৈষ্ণবঘাটা) : প্রিয়দর্শিনী

পুরুলিয়া : মনোজ টেক্সটাইলস

ঝালদা, পুরুলিয়া : বাঁকি বিহারী ক্লথ ষ্টোর্স

সম্পাদকীয়

কদিন আগেও মনে হয়েছিল, বাংলা ছোটগল্প বেরুবে না। অনেক টাকার প্রয়োজন কোত্থেকে জুটবে? এদিকে লেখা সংগ্রহ সুরু হয়ে গেছে। যখনই আমরা একত্র হই, ওই একই আলোচনা। দিলীপ সেন সোজা হয়ে বসে, কোমর ভেঙে হাত পা বাঁকিয়ে বসে থাকা দেখতে পারে না। বলে কাজ চলুক, হয়ে যাবে। লিটিল ম্যাগাজিনের টাকা চিরকাল যে ভাবে জোগাড় হয়েছে সেই ভাবেই হবে। দিলীপ প্রতুল প্রায়ই বড় বড় তেলেভাজার ঠোঙা নিয়ে আসে। মুড়ি চা তেলেভাজায় ডুবে যাই সবাই। ভুলে যাই টাকা নেই।

গত নভেম্বর মাসে একটি পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাস উল্টে গিয়ে অমিয়বাবুর দুখানা হাতই ভেঙে দেয়। আমরা ভেঙে পড়েছিলাম। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের তিন তলার কেবিনে আমরা সবাই ঝিম মেরে বসে থাকতাম। দুহাত প্লাস্টারে বাঁধা অমিয়কে সিগারেট চা খাইয়ে দিতে হতো। প্রতিদিনই ভয় ছিল হাতের ডাক্তার কখন ওকে জগন্নাথ বানিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ভাঙা হাত জোড়া লেগেছে। অমিয় এখন নিজের হাতে সিগারেট খায়। নিজের হাতে গল্প লেখে। হাতেল সাপটে ধরে বাসে উঠে পড়ে। জোড়ালাগা হাত নাড়িয়ে বলে, হয়ে যাবে, টাকা জোগাড় হয়ে যাবে। তৃপ্তি বসু দূর লক্ষ্ণৌ থেকে ভরসা জোগায় চিঠিতে, বলেন, কোন রকম অসুবিধে হলে জানাবেন, কোন সংকোচ করবেন না। অমূল্যদা বলেন, আমরা তো আছি। ছোটগল্পের কাগজ নেই, বার করতেই হবে। কালী মুমার চক্রবর্তী বলেন, কদিন ছুটি না নিলে ঠিক মতো কাজ হবে না। ছুটি নিয়ে লড়ে যাব। বিপুল সেনগুপ্ত কদিন অসুস্থ থাকায় মন মরা হয়ে গেছেন। অহর সেনগুপ্ত শরীর কাঁপিয়ে বলে, জান দিয়ে দেব। চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে প্রতুল কুণ্ডু তেলেভাজার সঙ্গে হাসির গল্প জুড়ে দেয়। কখনো ওর গাড়িতে সবাইকে টিপেটুপে তুলে নেয়। রাতের রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরপাক খাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত দশ হাতের সহযোগিতায় যা হলো তা সবার সামনে তুলে দিলাম।

অজিতমোহন গুপ্ত বলছিলেন লিটল ম্যাগাজিনের নেশা কি আমি জানি।

নিজে তো করেছি বহু বছর। পৃথিবীতে সব চাইতে বড় নেশা হলো এইটে। লিটল ম্যাগাজিনের মৃত্যু নেই। প্রত্যেকটি লিটল ম্যাগাজিনই যে ক'টি সংখ্যাই যায় হোক না কেন, কিছু না কিছু কাজ করে যায়। কিছু লেখককে এগিয়ে দিয়ে যায়। নতুন লেখককে আত্মবিশ্বাস দেয়। সাহিত্যের পালাবদল ঘটায়।

লিটল ম্যাগাজিনের কোনো সংজ্ঞা নেই। লেখকদের নিজস্ব লেটার প্যাড লিটল ম্যাগাজিন। লিটল ম্যাগাজিনে লেখকরাই লেখেন লেখকরাই পড়েন। কোনো লিটল ম্যাগাজিন কখনোই সকলের কাগজ হতে পারে না। তারা সব রকম পাঠকের মন জোগানো বিষয় সম্ভার অর্থাৎ সিনেমা খেলা নাটক যাত্রা যা কিছু হতে পারে তা দিয়ে কাগজ ফুলিয়ে তুলতে চায় না। তারা যে বিষয় নিয়ে কাগজ করে সে বিষয়েই তাদের নির্দিষ্ট মনস্ক হতে হয়। ফলে এর পাঠক নির্দিষ্ট।

যশোধরন দত্ত

Space Donated by :

★

A Well Wisher

পুজোয় চাই নতুন জুতো

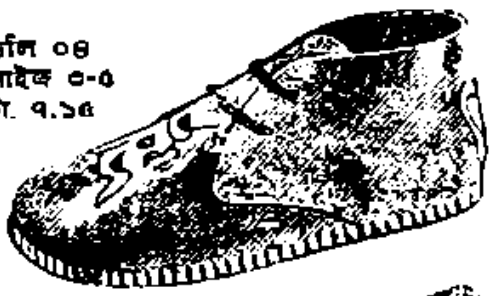

ডলি ০৪
সাইজ ৩-৫
টা. ৭.১৫

টোনি ৫৭
সাইজ ৩-৬, ৭-১০
টা. ১১.৯৫,
১০.১৫

টিম্বু ৪১
সাইজ ৫-৮, ৯-১২
টা. ৬.৯৫,
৭.১৫

লিলিপুট ৫৬
সাইজ ৩-৬
টা. ১৮.৯৫

বন্‌বোহার ১২
সাইজ ২-৮
টা. ৭.৫০

ব্যালেরিনা ৫৫
সাইজ ১-১১, ১২-১, ২-৬
টা. ২০.৯৫,
২০.৯৫, ২৬.৯৫

পিন্টু ৬৮
সাইজ ৩-৬, ৭-১০, ১১-১
টা. ১.১০, ১১.৯৫,
১০.১৫

ওয়েজাই-ডাহ্‌স ৫০
সাইজ ১-১১, ১২-১, ২-৬
টা. ২৪.৯৫, ২৮.৯৫,
০৩.৯৫

Bata

প্রতি মাসেই ৭৫০ টাকা আপনার

দেশের ও সমাজের কল্যাণার্থে সীমিত পরিবারের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে রোজ অতি সহজেই ৫টি কেস সংগ্রহ করে যে কেউ দৈনিক ২৫ টাকা অর্থাৎ মাসে ৭৫০ টাকা (প্রমোটার মানি) রোজগার করতে পারেন।

এ'বারের বিশেষ সুযোগ

১লা মে থেকে কলিকাতা সহ পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি জেলার হাসপাতাল এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানে বিশেষ **ভ্যাসেকটমি** ও **টিউবেকটমি** অস্ত্রোপচার শিবির খোলা হয়েছে।

কে কি পাবেন ?

পরিবারের কল্যাণ ও সমগ্র জাতির স্বার্থে স্বেচ্ছায় স্থায়ী গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা—

(১) **ভ্যাসেকটমির ক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে অস্ত্রোপচারের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছাড়াও নগদ পাবেন—**

[ক] এক বা দুই জীবিত সন্তানের পিতা—১০৫ টাকা।
[খ] তিন জীবিত সন্তানের পিতা—৬০ টাকা।
[গ] চার বা অধিক জীবিত সন্তানের পিতা—৫০ টাকা।

(২) **টিউবেকটমির ক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে অস্ত্রোপচারের পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ছাড়াও নগদ পাবেন—**

ক] এক বা দুই জীবিত সন্তানের মা—১০০ টাকা।
খ] তিন জীবিত সন্তানের মা—৪০ টাকা।
[গ] চার বা অধিক জীবিত সন্তানের মা—৩০ টাকা।

• • •

যাঁরা অস্ত্রোপচারের সুযোগ সুবিধা বর্ণনা করে স্বেচ্ছায় কেস নিয়ে আসবেন তাঁরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের পর নগদ পাবেন (প্রমোটার মানি) —৫ টাকা।

যে মহিলা অস্থায়ী গর্ভ নিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আই, ইউ, ডি, গ্রহণ করবেন তিনি পাবেন—৫ টাকা।

● পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনার জাতীয় আন্দোলনে সামিল হোন্।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার মাস মিডিয়া হইতে প্রচারিত।
Advt. No. 326/76-77

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ

সিগারেট খাওয়া
স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING

CIGARETTE SMOKING
IS INJURIOUS TO HEALTH

WVF-8368-3R

With best Compliments from :

B. K. SHAW AGENCIES

23, Canning Street
(1st floor)
Calcutta-1

Phone : 22-5713

আকাশে শরৎ। মানুষের মন
এখন মেঘের সঙ্গী। ছুটতে চায়
দূর দিগন্তে যেদিকে নদী, সমুদ্র,
পর্বত, যেদিকে সৌন্দর্য এবং
সুষমা। আমরা জানি। এবং
আমরা প্রস্তুতও। মানুষের আসা-
যাওয়ার পথের ধারে আমরা
বাড়িয়ে আছি হাত সাহায্যের,
সৌজন্যের, সহযোগিতার।
বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই।
তার নাম শৃঙ্খলা। জীবনের
চলা-হাঁটার পথে শৃঙ্খলাও এক
সৌন্দর্য।

পূর্ব রেলওয়ে

পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্র আমাদের গর্ব আর আনন্দের জিনিস

পশ্চিম বাংলার তাঁতশিল্প তার সূতী ও রেশমের বিরাট বস্ত্রসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বয়ন বৈচিত্র্যে আর উৎকর্ষতায় পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্রের তুলনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকার কর্তৃক প্রচারিত।

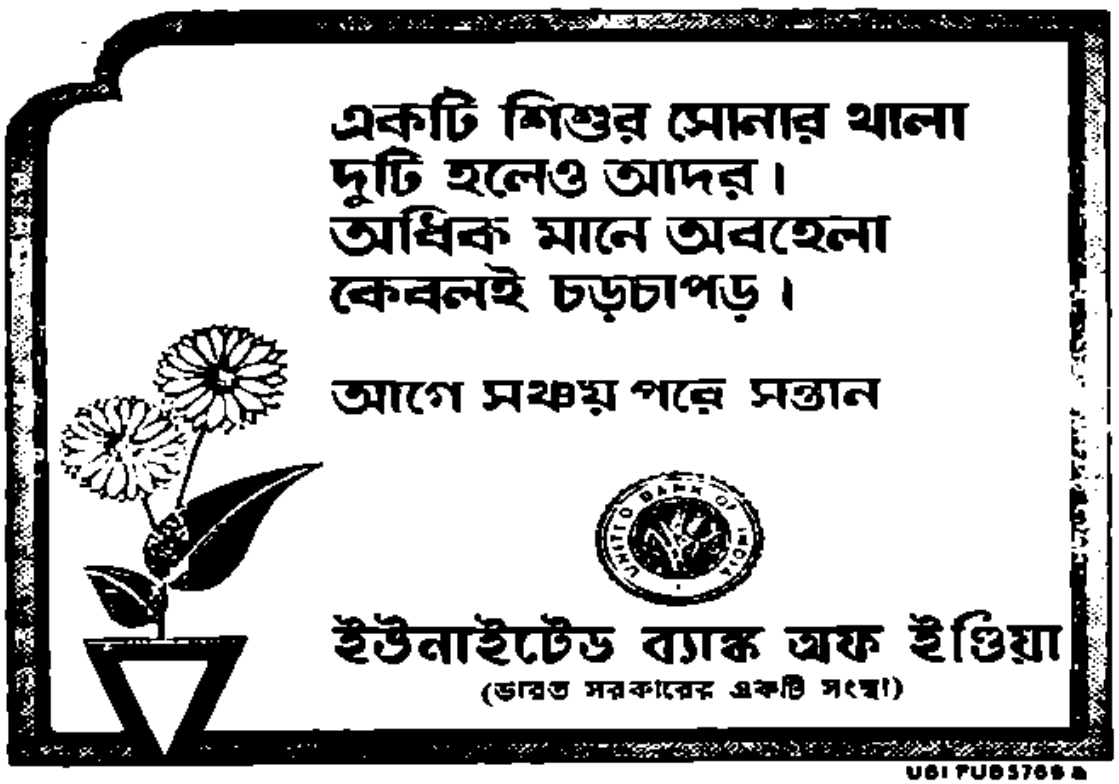

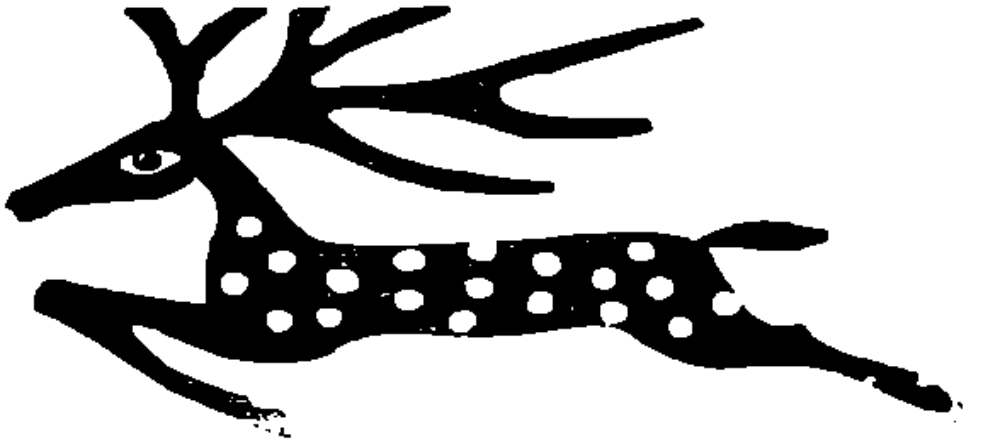

ছুটন্ত কলকাতা

কলকাতা ছুটতে চায়।
বনের হরিণ যেমন করে ছোটে বনে
ব্যগ্র এবং বাধাহীন। কিন্তু পারে না।
শহরের এলাকার তুলনায় বাড়ন্ত
জনসংখ্যা, জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্প
যান-বাহন, যান-বাহনের তুলনায়
সংকীর্ণ সড়ক স্বভাবতই তার অগ্রগতির
পথে বাধা। আমরা জানি, কলকাতার
মানুষ আজ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে
সেই গতিময় যানটির দিকে, যার নাম
ভূগর্ভ রেল।

কারণ, ভূগর্ভ রেলের হাতেই সেই
ভবিষ্যৎ, যখন ছুটন্ত কলকাতা এক
দৌড়ে পৌঁছে যাবে তার সিদ্ধি এবং
সমৃদ্ধির লক্ষ্যস্থলে ; ব্যগ্র এবং বাধাহীন।

MJ

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

ডব্লিউ-বি-আই-ডি-সি কি আপনার তালিকায় আছে ?

মঞ্জুরীকৃত মোট অর্থ ৩০ কোটিরও বেশী। গত বছরে মোট প্রদত্ত অর্থ ২·৪৭ কোটি টাকা। (তার আগের বছরের ৪৬ লক্ষ তুলনীয়)
সাহায্যপ্রাপ্ত মোট শিল্পের সংখ্যা —৯৭
এদের মধ্যে ১৫টির উৎপাদন ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে।

কাদের সাহায্য করা হচ্ছে ? মাঝারী বা বড় বেসরকারী শিল্প যাদের শিল্প সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি বাবদ স্থায়ী বিনিয়োগ ১০ লক্ষ টাকার বেশী।

কি জন্য ? বর্তমান শিল্পের যথেষ্ট সম্প্রসারণ (স্থায়ী সম্পদের ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি), বিকীর্ণকরণ বা পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প স্থাপন।

কেমন করে ? পরিকল্পনা রূপায়নে কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা, শেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ, বিক্রয়কর ফেরৎ, বৈদ্যুতিকশক্তি বাবদ ব্যয়ের আংশিক পরিপূরণ অকট্রয় করের পরিপূরণ এবং অনুন্নত এলাকায় শিল্পস্থাপনে বিশেষ সাহায্যদান।

ডব্লিউ-বি-আই-ডি-সির সঙ্গতি কতখানি ? শেয়ার মূলধন ৩·৪৩ কোটি টাকা এবং বণ্ড বিক্রয়লব্ধ আয় ৮·৮ কোটি টাকা। শিল্পকে উৎসাহমূলক সাহায্যদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাজ্য সরকার দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া শিল্পোদ্যোগীদের শিল্প পরিকল্পনায় এবং শিল্পোন্নয়নে যথাযথ পরামর্শ দেবার জন্য আছেন প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ কর্মীবৃন্দ।

আর কিছু প্রশ্ন আছে ? জনসংযোগ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করুন।

WbIdC

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভালেপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ

২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

টেলিফোন : ২২-২৪৪৮, ২৩-১৬১৫, ২৩-১৬২৮

গ্রীষ্মে, শরতে, হেমন্তে, বসন্তে সব ঋতুতেই

কালিম্পঙে

বসে রঙ্-রূপের মেলা

কটু পরিবর্তনের ছন্দে ছন্দে কালিম্পঙের রঙ্ বদলায়। কিন্তু বরফ ঢাকা চূড়ার ভেরা এই ছোট্ট জায়গাটির ওপর সবসময়ই বহুয়াড়ের অকাশ। যে কোনদিন চলে আসুন— একা কিংবা সঙ্গী সাথী নিয়ে। আপনার স্বচ্ছন্দযাত্রা সুনিশ্চিত নিশ্চয়ই ট্যুরিস্ট লজ বা কম খরচে

পাহাড়িয়া ট্যুরিস্ট লজ বেছে নিতে ইচ্ছা যাদুন। কয়েকটি দিন আনাদে কাটাবার জন্য কালিম্পঙ বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার। আর, ইচ্ছামত, দার্জিলিঙ (৫১ কিলোমিটার) বা গ্যাংটকও (৭৭ কিলোমিটার) ঘুরে যেতে পারেন।

বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন:
রিজার্ভেশন কাউন্টার,
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন,
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১
অথবা ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ
বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: ২৩-৮২৭১, গ্রাম: TRAVELTIPS

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

PR/TB/A168/76

"পায়ে পড়ি তোমার
একটা গল্প তুমি লেখো—শরৎবাবু
নিতান্ত সাধারণ মেয়ের গল্প"
—রবীন্দ্রনাথ

সাধারণ অসাধারণের দ্বন্দ্ব
সমন্বয় সাধনে
বাংলার ঐতিহ্য মণ্ডিত তাঁত
শিল্পের উন্নতি-কল্পে
আত্মনিবেদিত

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ
সোসাইটি লিমিটেড

৬৭, বক্সীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪

গ্রাম: কো-হ্যাণ্ডলুম
ABC/T/76

ফোন : ৩৫-৩৬৫৮/৩৫-৬৩৪৮

With Best Compliments from :

BAGCHI TRANSPORT CO.

and

Metropolitan Transport Co.

Regd. Office at :
34, C. R. Avenue
Calcutta.

Tel. No. 34-8739

একথা বললে বেশী বলা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদনও বন্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসাবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরনে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি দিকে দিকে।

এ পর্যন্ত আমরা ২,৯০৯টি মৌজায় (১০,৪৪৭টি গ্রামে) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৩০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ও পরিবহন লাইন পাতা হয়েছে, ফলে সুদূর গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের খতিয়ান আরো উল্লেখজনক। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৪৭টি গভীর নলকূপ, ৬৯৫২টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯টি রিভার লিফট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, ফলে এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাঙলার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাচ্ছে। আমাদের সম্প্রসারণ কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালডিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাঘাটের ৩×২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও ব্যাণ্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই রকম দ্রুতগতিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ট্রান্সমিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিংচিনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলঢাকার ২য় পর্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের রাম্মাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন ডিজেল জেনারেটিং সেটগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী বাবদ ৬৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরো বেশী টাকা সংগ্রহের জন্য।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান দিতে আমরা প্রতিনিয়তই সচেষ্ট—বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মানেইতো দেশের সার্বিক উন্নতি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

প্রগতির চাবিকাঠি বিদ্যুৎ

বিশেষ সুযোগ

বাংলা সাহিত্যের ও রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরসপিপাসা চরিতার্থ করবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হচ্ছে। ১৯৭৭ সালের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে।

১ **কবির ভণিতা** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ২·৫০

২ **পল্লী-প্রকৃতি** ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪·৫০

৩ **Boundless Sky** । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৪·৫০

৪ **রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা** ॥ প্রথম ১৫·০০, দ্বিতীয় ২০·০০

৫ **জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ** ॥ ১৪·০০, বোর্ড ১৬·০০

৬ **সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা** ॥ প্রমথ চৌধুরী।
৮·০০, শোভন ১০·০০

৭ **যা দেখেছি যা পেয়েছি** ॥ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। ১৪·০০

কমিশনের হার

সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০·০০। পুস্তকবিক্রেতা শতকরা ৩০·০০

বিশ্বভারতী

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ৭১

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

আশা

মহাশ্বেতা দেবী

সেদিন ট্রামে মল্লিকার মাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মল্লিকা সরকারের মা ট্রামে সদ্যবিধবার পোশাকে ভিক্ষে চাইছেন। ভিক্ষে চাইবার রীতিটি খুবই শোভন ও সুন্দর। চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন টার্মিনাসের ট্রামে।

আপিস যাত্রীদের ভিড়, ট্রামটি বোঝাই। কিছুই বলছেন না উনি, ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, সকলের সামনে একটু দাঁড়াচ্ছেন। হাতটি পাতা, পয়সা পড়ছে।

আমি বললাম, আপনি এখানে?

অবাকও হয়েছিলাম, দুঃখিতও। মল্লিকা সরকার এখন মল্লিকা হাজরা। কানাডায় থাকে, সেখানেই থাকবে। কিন্তু ওর বাবা মারা গেলেন কবে? যদি মারা গিয়ে থাকেন, তবে ওর মা ট্রামে ভিক্ষে করছেন কেন?

আমার প্রশ্নটি অনাত্মরিক ছিলনা বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু মহিলা উত্তর দিলেন না। হেঁটে চলে গেলেন। বোঝা গেল আমাকে উনি চিনতে চাইলেন না।

নিজেরও পরে খারাপ লাগল। যদি উনি ভিক্ষে করতেই পারেন, আমি কেন দিতে পারলাম না? কোথায় বাধল? অথবা কিসে?

মল্লিকাকে আমি চিনতাম বললে ঠিক বলা হয় না। ওকে দেখেছিলাম ছোট্ট একটি মেয়ে। ওর বাবা সামান্য কাজ করতেন, মা খুবই সাধারণ, আজ-কালকার ভাষায় অশিক্ষিতই বলতে হবে। কেননা মহিলা রাঁধতেন, মেয়ে দেখতেন, সংসার ঠেলতেন। মল্লিকা ছিল ফুটফুটে একটি মেয়ে, পাড়ার সকলের প্রিয়।

একদিন ওর মা এসেছিলেন সুপারিশের জন্যে। মেয়েকে ভর্তি করবেন কলকাতার অন্যতম অভিজাতশ্রেষ্ঠ ইংরিজী মিডিয়াম বনেদী স্কুলে।

আমি অবাক হয়ে রূঢ় কথাই বলেছিলাম। সে স্কুলের মাইনে, ইউনিফর্ম, আজকের ফাংশন, কালকের গার্জিয়ানস টি পার্টি মিলিয়ে মাসে আড়াই শো টাকার ধাক্কা, অবশ্য বাস খরচ ধরে।

মহিলা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন সে সব উনি জানেন। ওঁর জিজ্ঞাস্য, আমি ভর্তি করতে সাহায্য করব কি না।

প্রিন্সিপালকে লিখে দিয়েছিলাম। মল্লিকা ভর্তি হয়েছিল। কি করে মল্লিকার বাবা ওই স্কুলে মেয়েকে পড়ালেন, সেটা আমার কাছে আজও সংসারের অন্যতম আশ্চর্য হয়ে আছে। সরকারী নথিতে পাঁচশো টাকা থেকে সাতশো টাকা মাইনে-গ্রুপের একটি লোক মেয়েকে ওই স্কুলে পড়িয়ে অভিজাত তৈরি করাকে মনে হয়েছিল ব্যাবিলোনের শূন্যে উদ্যানের চেয়েও বিস্ময়কর।

দেখতে পেতাম বাবা বাড়ির তৈরি রুটি তরকারি কৌটোয় ভরে নিয়ে দেরিতে ক্লাস ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছেন। দেখতে পেতাম মা বেলায় বাজার করে ফিরছেন কাহিল একটি থলি নিয়ে।

দেখতে পেতাম পাড়া চমকে দিয়ে মস্ত বাস আসছে, মল্লিকা দামী ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে মার আঙুল ধরে। মনে হত আমার সামনে আধুনিক জীবনের একটি ট্রাজিডী ঘটছে।

অথচ সে ট্রাজিডীর তিনজন অংশগ্রহীতার চেহারাতেই সুখ জলজল করত।

একদিন দেখলাম, তখন মল্লিকা একটু বড়, ও একা দাঁড়িয়ে থাকে। মা তুলে দিতে আসেন না। তবে নেবার সময়ে উনি এসে একটু আড়ালে দাঁড়ান।

শুনেছিলাম, ওটা মল্লিকার নির্দেশ। একটি অনভিজাত ঠিকানায় থাকে, তাতেই ওর লজ্জার শেষ নেই। বন্ধুদের ঠিকানা কি সুন্দর সুন্দর, কি চমৎকার বাড়ির সামনে বাস দাঁড়ায় ওদের।

বন্ধুদের মা-রা কত চমৎকার। মাসে মাসে গার্জেনদের মিটিঙে মায়েরা আসেন বাড়ির গাড়িতে, সুন্দর সেজে, ঝলমল করতে করতে।

মল্লিকা থাকে বাই-লেনে। গার্জেনদের মিটিঙে ওর মা যায় না, যান বাবা। তাঁর চেহারা দেখলেও মল্লিকার লজ্জা করে। মা রাস্তায় দাঁড়ালে ওর লজ্জা আরো বেশি। বন্ধুরা না কি জিগ্যেস করে, ও কে? তোমাদের ঝি নাকি?

অবশ্য 'ঝি' নয়, 'আয়া' অথবা 'মেড' বলে থাকবে। কিন্তু মাকেই বলে, আর মল্লিকা কেমন করে মাকে পথে দাঁড়াতে দেয়?

ঠিকে ঝিরা পাড়ার বিশ্বস্ততম সংবাদ বাহক। একদিন সেই বলেছিল, মল্লির মার কাণ্ড শুনেছ?

কি কাণ্ড ?

আমাকে দিয়ে স্তাকরার কাছে আংটি বেচাল।

তাতে কি হল ?

মল্লির কোন্ বন্ধুর নাকি জন্মদিন। তাতে যাবে বলে সেই টাকায় জামা হল, পুতুল কেনা হল। গ্রাসের চেয়ে ভাতের থলা বড় হলে এমনি হয় বটে !

আমি বলেছিলাম, এ তো জানা কথা।

যা জানতাম না, জানা উচিত ছিল, শুধু খরচ-খরচায় নয়, শিক্ষায়,—পরিবেশে—সাহচর্যে মল্লিকা অন্য মানুষ হয়ে যাচ্ছিল, অন্য জগতের মানুষ।

সে জগতে গ্রীষ্মে কেউ কলকাতা থাকে না, মানালি চলে যায়। বাবারা বছরে দু'বছরে বিদেশ যায়, মায়েরাও। ভাইবোন হরদম উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে যায়। বিদেশই আত্মীয়বন্ধুর জগৎ সে জগতে সবাই বিদেশী জামাকাপড় পরে।

সে জগতে কারো বাবা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে চড়ে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় অপরাধীর মত মুখ করে আপিস যায় না জীর্ণ পোশাকে। সে জগতে কারো মা শুধু মেয়েকে সুখাদ্য বেড়ে দিয়ে নিজের আর স্বামীর জন্যে আলুচচ্চড়ি আর রুটি বেড়ে নেয় না।

হ্যাঁ, ওদের নাভিশ্বাসই উঠে গিয়েছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের মত ঘর পুড়িয়ে আনন্দ করতে কেউ জানে না। নিজের সাধ্যের বাইরের জীবনের ভাগ নিতে গিয়ে হেরে গেলে একমাত্র মধ্যবিত্তই হার স্বীকার করে না।

তাই মল্লিকার বাবা বলতেন, এডুকেশন হচ্ছে ওমনি থিং যা সন্তানকে দেওয়া উচিত। বাড়ি-গাড়ি-টাকা রেখে যাবার কথা ভাবা ঠিক নয়।

যেন ঠিক হলেই তা ভাবা ওঁর সাধ্যে কুলোত !

এমনি করেই মল্লিকা স্কুল পেরিয়ে অনুরূপ অভিজাত একটি কলেজে গিয়েছিল।

শুনেছিলাম ওরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। মল্লিকার বাবা অনেক ভাড়া বাকি রেখেছেন, সেটা একটা কারণ।

আর, উনি আরেকটি কাজ নিয়েছেন সন্ধ্যার পর। কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকতে হবে।

মল্লিকা গিয়েছিল চাকুরে মেয়ে ও ছাত্রীদের এক হস্টেলে। ওর সঙ্গে না কি বাবা অথবা মার বনিবনা হচ্ছিল না। ও চাইছিল প্রথম জীবন, প্রথম জগৎ ত্যাগ করে দ্বিতীয় জীবনে, দ্বিতীয় জগতে অজানা হতে।

ওর বাবা আর মার পক্ষে প্রথম জীবন ও জগতের মানপর্যায়ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। মেয়েকে পড়াতে গিয়ে ওঁরা জেরবার হয়ে গিয়েছিলেন।

তাই মল্লিকা গিয়েছিল হস্টেলে। ওর বাবা-মা কোথায় গিয়েছিলেন জানি না। সম্ভবত বস্তিতে।

মল্লিকা অবশ্য ওঁদের উপর নির্ভর করেনি আর। ও কলকাতার অন্যতম সর্বাধিক বিজ্ঞাপিত ফ্যাশন মডেল হয়েছিল।

সব কাগজেই ওর ছবি দেখা যেত। সুন্দর গাড়িতে, উদ্ধত ভঙ্গীতে। মধুর হাসিতে।

দামী স্কুলে পড়ার ফলেই ওটি সম্ভব হয়েছিল। বন্ধুর দাদাই ওকে প্রথম ফ্যাশন মডেল করেন। চেহারা, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, প্রয়োজনীয় মাপ, সব থাকার ফলে মল্লিকা বাকিটুকু নিজে করে নিয়েছিল।

মল্লিকার বিষয়ে কোথায় একটা আগ্রহ ছিল মনে। ওর ছবি দেখতাম নজর করে। তারপর একদিন কাগজে ওর বিয়ের খবরও দেখেছিলাম।

খুব অবাক লেগেছিল। কেন না বাড়িতে শুনতাম মল্লিকার বাবা-মা রেল লাইনের ওপারে কসবা চলে গেছেন। ওর মাকে মাঝে মধ্যে দেখতাম। পাড়ার একটি ছেলে কসবায় কণ্ট্রাক্টরী করতে যেত বলে ওঁদের খবর মোটামুটি পাওয়া যেত।

মাঝেমধ্যে। পুরণো কোন রেকর্ড যেমন মাঝেমধ্যে শোনা যায়। তেমনি অবাধ্যতায়, স্মরিত হবার জন্যে ওঁরা ফিরে ফিরে আসতেন টুকরো খবর হয়ে।

মল্লিকার বাবা অসুস্থ, ওঁর কাজ নেই।

মল্লিকার মা দিনান্তে মেয়ের নাম করেন না।

মল্লিকার সঙ্গে ওঁদের কোন যোগ নেই।

মল্লিকা সাহেবকে বিয়ে করে বিদেশে চলে গেছে।

কিন্তু ট্রামে মহিলাকে দেখে মন খুব খারাপ হয়েছিল নিমেষের জন্যে। ছোট্ট মেয়েটিকে ভর্তি করার জন্যে যেদিন আনেন, সেদিনই ত ট্রাজিডীর বীজ বপন হয়। তা বলে ওঁর এই পরিণতি দেখতে চাইনি।

আশ্চর্য। সেদিনই সন্ধ্যায় ওঁকে আবার দেখলাম। রেল লাইনের ধারে থেকে শাঁকালু কিনছেন।

ওঁর হাত ধরলাম। বললাম, সকালে চিনতে পারেন নি?

পেরেছিলাম।

কথা বললেন না ?

কি বলব ?

মল্লিকার বাবা···কবে···

ও।

ভদ্রমহিলা আশ্চর্য নির্লজ্জতায় বললেন, ওঁর ত কিছু হয় নি ?

সে কি ?

এ ত ভিক্ষের পোশাক !

ও !

এবার আমি বোবা হলাম।

পোশাক না ধরলে মানুষ ভিক্ষে দেবে কেন ? উনি কতদিন পোড়ো হয়ে আছেন। কাজ করে খাই সে যোগ্যতাও নেই, তাই ভাবলাম ভিক্ষেই ভাল !

মল্লিকা···

ওর নাম করবেন না দয়া করে।

কিন্তু ওকে ওই সাধ্যের অতিরিক্ত করে পড়াতে গিয়ে···

ভদ্রমহিলা শুভ্র, শীর্ণ, সুন্দর হাসলেন। বললেন, এ কি বললেন, মানুষ আশা কি করে না ?

কিন্তু···

আশা কি সব সময়ে মেটে ?

এ কথার উত্তর খুঁজে পেলাম না। কথাটা সত্যি, সেই জন্যেই বোধ হয়।

ছোটগল্প ঃ একমুখী লক্ষ্যে

উজ্জ্বল মজুমদার

ছোটগল্পের চরিত্রটি মোটামুটি তিনটি সূত্রের ওপর নির্ভর করে আছে। ১. ছোটগল্প শব্দ-সংখ্যার স্বল্পতার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার সংহত নাটকীয় গুণের ওপর। ২. ছোটগল্পে ঘটনা বা অনুভূতির অনুপুঙ্খ বর্ণনায় খুবই সযত্ন ও সতর্ক নির্বাচনের প্রয়োজন। ৩. ছোটগল্প ঘটনা বা অনুভূতির বর্ণনায় একটি সামগ্রিক সামঞ্জস্য বা ঐক্যকে ফুটিয়ে তোলে।

এডগার অ্যালান পো ছোটগল্পের যে সংজ্ঞার্থ দিয়েছিলেন তার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তাঁর সংজ্ঞার্থের মোটামুটি বাঙলা ভাবানুবাদ করে দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, এই সংজ্ঞার্থটি একটি সাহিত্যিক আলোচনা প্রসঙ্গে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রাহামস্ ম্যাগাজিনে ন্যাথানিয়েল হথর্ন-এর 'টোয়াইস্ টোল্ড টেল্স্' বইটির আলোচনা (১৮৪২) করতে গিয়ে পো-র মনে এই সংজ্ঞার্থের আভাস এসেছিল। হথর্নের গল্পের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন :

একজন কৌশলী সাহিত্যশিল্পী কাহিনী গঠন করেছেন। যদি তিনি বিজ্ঞ হন তাহলে কতকগুলো ঘটনাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যে তিনি চিন্তার বিন্যাসকে প্রশ্রয় দেবেন না। এবং, অত্যন্ত সচেতন সতর্কতায় একটি বিশেষ বা 'একক' রসনিষ্পত্তিগত ফলশ্রুতির কথা ভেবে নেবেন। তারপর ঘটনাগুলিকে এমন ভাবে সাজিয়ে যাবেন যাতে এই পূর্বকৃত একমুখী রসনিষ্পত্তিগত ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। যদি তাঁর কাহিনীর একেবারে প্রথম বাক্যটি একমুখী রসনিষ্পত্তিতে সাহায্য না করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, প্রথম পদক্ষেপেই তিনি ব্যর্থ হলেন। সমগ্র রচনাটির মধ্যে একটিও লিখিত শব্দ থাকা উচিত হবে না যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওই পূর্বকৃত একমুখী পরিকল্পনাকে সাহায্য করবে না।

পো-র নিজের সমস্ত গল্পের মধ্যে, এমনকি তাঁর আলোচিত লেখক হথর্নেরও প্রায় সমস্ত গল্পের মধ্যেই একমুখী পরিণতির তত্ত্ব কাজ করেছে। গল্পের এই একমুখী সংহতি বেশির ভাগ ভালো ছোটগল্পগুলির লক্ষণ। হথর্নের একটি বিখ্যাত গল্পে এই একমুখী পরিণতি কী ভাবে কাজ করেছে তা সূত্রাকারে

দেখা যেতে পারে। গল্পটির নাম 'ইয়ং গুডম্যান ব্রাউন।'

(১) গল্পের নায়ক ব্রাউন একটি সন্ধ্যায় তার সুন্দরী স্ত্রী 'ফেথ'-কে ছেড়ে চলে গেল। যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে দেখলে, তার স্ত্রী উঁকি মেরে তার দিকে তাকিয়ে আছে বিষণ্ণমুখে। বাতাসে তার মাথার টুপির গোলাপী রিবনটি উড়ছে। ব্রাউন হাঁটতে হাঁটতে নিউ ইংল্যাণ্ডের আদিম বনাঞ্চলে পৌঁছে গেল। (২) বনের মধ্যে শয়তানের রাজ্য। বনের মৈশসঙ্গীতে দারুণ বিষণ্ণ বিলাপের সুর। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ব্রাউন দেখলে, সেখানে যে মানুষের সঙ্গেই দেখা হয় তার মধ্যেই পাপ রয়েছে। হঠাৎ এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধের চেহারাটা অনেকটা ব্রাউনেরই বাবার মতো। হাব-ভাবে মনে হয় সংসারটা তার ভালো-রকমেরই জানা শোনা। সেই বৃদ্ধই শয়তান,—'ডেভিল'। ব্রাউনের সঙ্গে সঙ্গে সে হাঁটতে লাগলো। ব্রাউন স্বপ্ন দেখছে কিনা বুঝতে পারলো না। সেই শয়তান ব্রাউনের মনে, শুধু ব্রাউন কেন, ব্রাউনেরই চেনা-শোনা আর পাঁচটা মানুষের মনেও, পাপের চেতনা জাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো। আর সেই জাগ্রত পাপের ছায়া পড়লো ব্রাউনের পূর্বপুরুষের ওপরেও। সেই ডেভিলই বললে, ব্রাউনের এক পূর্বপুরুষ কোয়েকার-দের ফাঁসি দিয়েছে। দলে দলে আদিম ইণ্ডিয়ানদের হত্যা করেছে। পাপের ছায়া পড়লো ব্রাউনেরই চেনা-জানা অগ্রজ-তুল্য সচ্চরিত্র মানুষগুলোর ওপরে। এবং শেষে, পাপের ছায়া এসে পড়লো তারই সুন্দরী স্ত্রী ফেথ-এর ওপরে।

(৩) পরের দিন সকালে ব্রাউন তার গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। কিন্তু যেন অন্য মানুষ। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি। গ্রামের বৃদ্ধ পুরোহিত তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন। ব্রাউন ভয়ে পেছিয়ে গেল তাঁকে দেখে। ক্লাব-ঘরের সামনে দিয়ে গিয়েই রাস্তার মোড় ঘুরতেই দেখলে, গোলাপী রিবন-বাঁধা উদ্‌গ্রীব তার স্ত্রী দারুণ খুশী হয়ে ছুটে আসছে। ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু ব্রাউন কঠিন ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফেথের দিকে।

(৪) লেখক একটু সংশয় রেখেছেন ব্রাউনের এই অভিজ্ঞতার ব্যাপারে। তিনি বলছেন, ব্রাউন কি ঘুমিয়ে পড়েছিল বনের মধ্যে? আর ঘুমিয়ে প'ড়েই কি বীভৎস স্বপ্নের মধ্যে ডাইনীদের সঙ্গে ঘুরেছিল? যাই হোক, এই গল্পের শেষ অংশে দেখি, ব্রাউন বৃদ্ধ হলো। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে সে যেন একটু রুক্ষ, বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সন্দিগ্ধ হয়েই রইল। তারপর থেকে চার্চের পুরোহিত যখনই বাইবেলের গল্প বলতো, তখনই ব্রাউনের মনে হতো, ওপরের

ছাদটা এখুনি ভেঙে পড়বে। রাত্রিতে সে ভয়ে চমকে উঠতো মাঝে মাঝে। বিড় বিড় ক'রে বকতো। তারপর একদিন বৃদ্ধ ব্রাউন মারা গেল। কিন্তু মৃত্যুর আগেও সে যে বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠেছিল তা নয়, বরং খুবই বিমর্ষ হয়ে তার জীবন শেষ হয়েছিল। চতুর্থ সূত্রের এই অংশের মধ্যে নেহাৎই রূপকথা-সুলভ সম্পূর্ণতা আছে। কিন্তু তার আগের সূত্রগুলিতে ব্রাউনের বিচিত্র বীভৎস অভিজ্ঞতার বা স্বপ্নের বর্ণনায় মানুষের জীবনের নিহিত পাপ-চেতনা, পাপের প্রতি তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ এবং পাপের দুর্মোচ্য স্মৃতির সত্যরূপটিকে দুর্লভ তীক্ষ্ণতার সঙ্গে আঁকা হয়েছে। গল্পের বক্তব্যও এই। এই লক্ষ্যেই এক-মুখী হয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন ব্রাউনের সমস্ত বীভৎস আরণ্য অভিজ্ঞতা। সেখানকার চরিত্রগুলির সঙ্গে তার আলাপের কথা বলেছেন। এবং লক্ষণীয়, সে চরিত্রগুলি তার প্রতিদিনের চেনা-শোনা মানুষ, যাদের অনেকেই আপাত দৃষ্টিতে খুব সৎ ও পবিত্র। প্রত্যেকটি সাক্ষাতেই সে বুঝতে পেরেছে, তার সঙ্গী শয়তানের সঙ্গে সকলেরই আলাপ আছে। সব মিলিয়ে নিজের সঙ্গেও এই শয়তান ও সঙ্গীদের কোথাও একটা মিল সে খুঁজে পেয়েছে। বুঝেছে সমস্ত 'পৃথিবী একটি কলঙ্ক চিহ্নের মতো, বিরাট একটি রক্তের ফোঁটার মতো।' এক সমবেত ভৌতিক জনতার মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সকলেই বুঝেছে, মানুষের স্বভাবেই পাপ। পাপেই তার সুখ।

এই তীক্ষ্ণ পাপ-চেতনার ফলেই পরের সকালটি থেকে সে একেবারে অন্য মানুষ। আমৃত্যু সে এই স্মৃতিতেই মাঝে মাঝে শিউরে উঠেছে। এই স্মৃতিই তাকে বিষণ্ণ, জটিল, আত্মতর্কময়, নিষ্ঠুর ও উদাসীন করে দিয়ে মৃত্যুর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। গল্পটি আকারে একটু দীর্ঘ-ই। কিন্তু সেই বীভৎস স্বপ্ন-জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ এবং অনুভূতি ব্রাউনের ওই তীক্ষ্ণ পাপচেতনাকেই তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। পাপের প্রতিরোধে স্ত্রীর ইঙ্গিতপূর্ণ নামটি (ফেথ্) ধরে সে চেঁচিয়েছে। তারপরেই স্বপ্ন শেষ। লক্ষণীয়, এই পাপ চেতনার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ, পাপের সঙ্গে মানুষের নিত্য ঘনিষ্ঠতা—এই লক্ষ্যে গল্পের প্রত্যেকটি ঘটনা (যা এখানে বলা হয়েছে সংক্ষেপে—কিন্তু মূল ঘটনাগুলিকে বিস্তৃত অনুসরণ করে) তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে এগিয়ে গেছে। এমন একটি চরিত্র বা সংলাপ নেই যা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত। কাজেই পো-র্ কথিত ঐক্য এখানে পুরোপুরি সক্রিয় বলেই মনে হয়।

২

আরেকটি গল্পের কথা বলি। তারাশঙ্করের বিখ্যাত গল্প 'বন্দিনী কমলা'। এই গল্পটিতে সংহতি ও পরিস্থিতির অভাব আছে। গল্পটি ধীর লয়ের গল্প—টেল জাতীয়। তাছাড়া গল্পের মধ্যেও গল্প আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা ফলশ্রুতি-গত ঐক্যও আছে। গল্পটির মূল ঘটনাগুলি ক্রমান্বয়ে সূত্রাকারে সাজিয়ে দিচ্ছি :

(১) প্রাচীন বনেদী জমিদারী। কোম্পানীর আমল থেকে তার বিস্তার। বিকেল চারটে। অথচ বাড়ির সকলে সব খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। নানা মহলে বিলাস, আলস্য ও দিবানিদ্রা এবং নাক-ডাকার বিচিত্র আওয়াজ। একটি পাগল মেয়ে আপন মনে বকে, হাসে, চিৎকার করে কাঁদে। তারপর দেবদর্শন-ফেরতা বাড়ির গিন্নীর গীতাপাঠ শোনা। 'রাত দশটা' অবধি 'দিবানিদ্রা'। তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে রাত দুটো।—এ সবই দেখা হচ্ছে জমিদার বাড়িতে আসা নতুন বৌ-এর চোখে। দেখে শুনে সে কখনো কখনো আপন মনে হেসে ফেলছে। কখনো বা ভীষণ ভয়ে শিউরে উঠছে। মাঝে মাঝে সিন্ধির নেশায় মেয়ে-পুরুষ বেঘোর হয়ে যায়। হাঁস, পায়রা, খরগোস, কুকুর—নানান জনের নানান জন্তু পোষার বাতিক।

(২) নতুন বৌকে খুঁজছেন শাশুড়ী। সকলের এই বিশ্রাম আলস্যের মাঝখানে গৃহস্থ ঘর থেকে আসা নতুন বৌয়ের ঘুম নেই বলে শাশুড়ীর কটু মন্তব্য—'গেরস্ত বাড়ির মেয়ে জমিদার বাড়িতে খাপ খাওয়াবে কি করে!' যাই হোক, বৌ হিসেবে তারই দায়িত্ব পড়লো লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেওয়ার।

ছোট কর্তা ধান খেতে গুয়োর মারতে যাবেন। রান্নার তাড়া। মেজবাবু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তাঁর ঘরে লোকজন এসেছে। বড়বাবুর বড় ছেলে অর্থাৎ এই ছোট বৌয়ের বড় ভাসুরের থিয়েটার-ক্লাবের রিহার্সাল বসেছে।

বাড়ির বিচিত্র বিস্ময় ছোট বৌয়ের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। লক্ষ্মীর ঘরে লক্ষ্মী বন্দিনী হয়ে আছেন একথা সে শুনেছে। তার কৌতূহলেরও শেষ নেই। গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ছোট বৌ উদাসীন সংসারে বেশ স্বচ্ছন্দ সাহসের সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে—তার একটু পরিচয়। লেখকেরই বিবৃতিতে জানা গেল—দু একটি সংলাপে যার ইঙ্গিত দিলে ছোটগল্পের চরিত্র বজায় থাকতো।

(৩) বড় গিন্নির সঙ্গে ছোটবৌ-এর দেখা। বড় গিন্নি যে তার অপরিপুষ্ট

নাতিটিকে সযত্নে মানুষ করছেন—তার প্রায় দশ লাইন বর্ণনা—যার সঙ্গে গল্পের মূল বক্তব্যের বিশেষ সম্পর্ক নেই। তারপর বড় গিন্নি ও বড়কর্তার সঙ্গে ছোট বৌ-এর সাক্ষাৎ।

(৪) ছোট বৌ অন্ধকার লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দিতে গিয়ে দিদি-শাশুড়ীর মুখে শুনলো, পূর্বপুরুষ দেওয়ান গোপীবল্লভের বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মীকে বন্দী করে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ছোট বৌয়ের মানসিক জগতে একটা মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নকল্পনা জাগলো। জাগলো উদগ্র কৌতূহল। সেই কল্পনাটির চমৎকার ছবি আছে গল্পের মধ্যে গল্প।

(৫) মেজকর্তার সঙ্গে বড়কর্তার উত্তেজিত কথা শুনলে ছোট বৌ। মান-ইজ্জৎ আলস্য-বিলাস বজায় রাখতে গিয়ে গোপীবল্লভের এই জীবন্ত উত্তর-পুরুষেরা ধার-দেনা করেছে এবং সে দেনা লাখ পাঁচেকে পৌঁছেছে। কর্তাদের মধ্যে নেশাখোর, পাগল, সম্পত্তি-গ্রাসী—সবাইকে চেনা হয়ে গেছে ছোট বৌয়ের। চিনে গেছে সে বার-মুখো উদাসীন স্বামীকেও। কিন্তু রাত্রি হলে ক্ষুধিত পাষাণের নায়কের মতো বন্দিনী কমলার কথা মনে হয়। দিনে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা। রাত্রিতে বন্দিনী কমলার মোহ ছোট বৌয়ের মনটিকে তীক্ষ্ণ সচেতন ও দুঃসাহসিক করে তোলে।

(৬) সেই দুঃসাহসে ভর করেই প্রথম দিন লক্ষ্মীর ঘরের তালায় সে হাত দেয়। অন্য দিকে সেইদিনই শোনে বড়-মেজ কর্তার আলাপ। দেনা হয়েছে ছ'লাখ মেজ কর্তা লক্ষ্মীর ঘর খুলে গুপ্তধন খুঁজতে চায়। বড়কর্তার আপত্তি। দিদি-শাশুড়ীও তাদের আত্মহত্যার ভয় দেখায়। অর্থাৎ, ছোট বৌয়ের লক্ষ্মীর ঘর সম্পর্কে কৌতূহল যেমন উদগ্র হচ্ছে, অন্যদিকে দেনাগ্রস্ত জমিদার বাড়িও লক্ষ্মীর ঘর সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

(৭) ছোট বৌ লক্ষ্মীর ঘরের দরোজা ঠেলে ঢোকে। প্রচণ্ড উত্তেজনার এই পরিণতি। শব্দ পেয়ে সকলে ছুটে আসে। সকলের সামনেই অন্ধকার ঘরে লণ্ঠন তুলে দেখা যায়, একটি নরকঙ্কাল, ধূসর একরাশ চুল, আর বিবর্ণ জীর্ণ একটি নামাবলী।

কাজেই ছোট বৌয়ের দিক থেকে সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনার শেষ। ঋণ শোধের রঙীন আশা তার ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জমিদার বাড়িরও।

কিন্তু এই শূন্য লক্ষ্মীর ঘরের নির্মম অভিজ্ঞতাই যদি গল্পের বিষয় হয়, যদি লক্ষ্য হয়ে থাকে জমিদার বাড়ির সমস্ত আত্মাভিমানের মূলে আঘাত করা,

তাহলে প্রথম তিনটি সূত্রের বিশেষ উপন্যাস-সুলভ বিস্তৃতি মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। অন্ততঃ ছোটগল্পের একমুখী পরিণতি ও সংহতির কথা মনে রাখলে। একমাত্র দু-নম্বর সূত্রে লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেখাবার দায়িত্বটিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। নইলে জমিদার বাড়ির আলস্য-বিলাসের পরিবেশ-বর্ণনা নেহাৎই স্বয়ং-নির্ভর স্বেচ্ছধর্মিতা এনে দিয়েছে। আলস্য-বিলাস-বাতিকের এই বর্ণনা যে একেবারেই মূল্যহীন তা বলি না, কারণ বাতিকগ্রস্ত জমিদার বাড়ির এই ভেতর-মহল ও বাইরের মহলের বর্ণনায়, একটা আত্মতুষ্টির মনোভাবই তারাশঙ্কর আনতে চেয়েছেন। নইলে মেজকর্তার মুখ দিয়ে এই কথা বেরোবে কেন—'হাজার পাঁচেক টাকার দরকার তাই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শালা বলে কিনা আগের দেনাটা প্রায় লাখ পাঁচেকে গিয়ে দাঁড়ালো।—জানে না বেটা উল্লুক, কার বাড়িতে লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।' এই আত্মতুষ্টির স্বপ্নই তো চুরমার হয়ে গেছে লক্ষ্মীর ঘর খুলে দিয়ে। কিন্তু ছোটগল্পে এই আত্মতুষ্টির প্রকাশ অনেক সংহত হতো, ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে তার প্রকাশ হয়ে যেতো। দ্রুত তুলির আঁচড় আর নিপুণ নির্বাচন-ই সেখানে প্রয়োজন ছিল —এখানে যা নেই। কাজেই প্রথম তিনটি সূত্র গল্পের বক্তব্যে ভূমিকা নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে ভূমিকা শিথিল উপন্যাসসুলভ ভূমিকা।

কিন্তু পরের চারটি সূত্রে সত্যিকারের ছোটগল্পের শিল্পী এসে যেন তুলি ধরেছে। এসেছে গল্পের মধ্যে গল্প। সে গল্প একজনের মনে যেমন মোহ ও কৌতূহল জাগিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ঘটনাচক্রে ঋণে-জর্জরিত বাড়ির কর্তাদের মধ্যে লক্ষ্মীর ঘরের রহস্যভেদ নিয়ে তর্ক শুরু হয়েছে। ছোটবৌ-এর মনে কৌতূহল জাগবার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদার বাড়িতে ঋণ শুধবার অঙ্কে লক্ষ্মীর ঘর খোলার কথা উঠলো—এ ব্যাপারটা একটু কৃত্রিম-বিন্যাস-কৌশল বা নাটুকেপনা ঠিকই, তবু সকলের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ছোটবৌ যখন লক্ষ্মীর ঘর খুলে দিলে, তখন সেই শূন্য ঘরের নরকঙ্কালই জমিদার বাড়ির বিনষ্টির প্রতীক হয়ে দেখা গেল। এই ব্যাঞ্জনাই তো ছোটগল্পের প্রাণ।

অথচ প্রথম তিনটি সূত্রে উপন্যাস-সুলভ যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে তার বিস্তৃত অনুপুঙ্খ বর্ণনা (জমিদার বাড়ির বিভিন্ন মহলের পুরুষদের ও মেয়েদের) গল্পটিকে 'টেল'-এর দিকেই টেনেছিল, পরের চারটি সূত্রে তা ছোটগল্পের পরিমিতি ও ব্যঞ্জনা নিয়েছে। সেইসূত্রেই চেকভের 'সক্রিয় অনুপুঙ্খ বর্ণনা'র তত্ত্বটিতে (থিওরি অব অ্যাকটিভ ডিটেল্‌স্) পৌঁছোতে হয়।

বিষ-স্মরণ

কবিতা সিংহ

রবীন্দ্রসদনে গানের আসর। আজ রাত সাতটায়। অথচ ওই একই দিনে বোকার মত সীমা সুকোমলের স্মরণ-সভায় ওদের ডেকেছে।

অঞ্জনের কাছে এখন প্রতিটি মুহূর্তই অর্থপ্রসূ। প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। তবে একথা সত্যি অঞ্জন অন্তরে অন্তরে ভেঙে যাচ্ছে সুকোমলের জন্যে। ওখানে কোনো খাদ নেই।

অঞ্জন হাত বাড়িয়ে জানলার বাইরে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। রবীন্দ্র-সদনে যাবার পথে ড্রপ্ করে গেলে কোনো অসুবিধা নেই। এখন সাড়ে পাঁচটা। তা অন্তত ঘন্টা খানেক থাকা যেতে পারে। আজকের গানের জলসাটাও ভম জমাট্ হচ্ছে। নামী দামী প্রায় সবাইকেই ডেকেছে এবার বিশ্ববাবু। প্রবীণ গায়কদের সংখ্যাই বরং কিছুটা কম। প্রতিষ্ঠিত নবীন গায়কদের সংখ্যা তুলনায় একটু বেশি বলেই মজাটা আরো জমবে। কার হাতে কি তাস আছে সব তো আর জানা যায়নি এখনো। তবে এবারে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে-ছিল। গাইয়েদের নামের তালিকায় সুকোমল দত্তর-ও নামটা উঠে গিয়েছিল। অঞ্জন তো জানতনা সুকোমল এত তাড়াতাড়ি মারা যাবে, তাই সে অলকাদের আসরে গিয়ে মন্তব্যও করে বসেছিল,—'আচ্ছা ওর নামটা হঠাৎ লিষ্ট-এ ঢুকে গেলো কি করে বলোতো?

—সত্যি সুকোমল তো এখন আর তেমন নামী দামী কিছু নয় আর!

—মার্কেট্ নেই, কোনো কমার্শিয়াল ভ্যালুও না, আমার মনে হয় ইদানীং বিশ্ববাবু ওর সম্বন্ধে কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, অলকা চন্দনের কথায় সায় দিয়ে বলল।

—বিশ্ববাবু কার সম্বন্ধে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন? অঞ্জন সম্বন্ধে, না সীমার সম্বন্ধে…

অঞ্জনই পা দোলাতে দোলাতে ভারিক্কী চালে বলেছিল,—সীমার কিন্তু এখনো একটা বোকার মত ধারণা আছে, সুকোমলের সম্বন্ধে কোথাও কোথাও নাকি সুবিচার হয়নি।

অলকা আবার দাঁতে দাঁত পিষল,

—অর্থাৎ প্রতিভার সম্যক মর্যাদা মেলেনি, এইতো? ও ধারণা সব-বৌদ্ধেরই নিজের নিজের স্বামী সম্বন্ধে থাকে। আমারও আছে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ওপর হাল্কা করে বুলিয়ে নিল অঞ্জন। কোলের ওপর রবীন্দ্রসদনের হ্যাণ্ডবিল আর পাৎলা চিঠিটাও ছিল। সবাই আছে সুব্রত, সরল, চন্দন, অলকা, অঞ্জন, এর মধ্যে সত্যিই সুকোমলের নামটা কেমন যেন বেঢপ লাগছিলো।

জানলার বাইরে পোড়া সিগারেট-টা ফেলতে গিয়ে হঠাৎ অঞ্জন দেখলো তার বাঁ-পাশে সহসা উপস্থিত হয়েছে চাকুরিয়া লেকের দৃশ্য। অঞ্জনকে যেতে হবে লেক-গার্ডেনস্-এর ইনটিরিয়রে। ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে লেকের দিকেই যেতে বলল। খানিকটা ফাঁকা হাওয়ায় ঘুরপাক খেয়ে নিয়ে তারপর সে লেক-গার্ডেনস্-এর দিকে যাবে।

সেতুর কাছটায় এসে হঠাৎ স্মৃতির কতকগুলো ঝলক্ ছুটে এলো অঞ্জনের দিকে। ওই তো সেই রাধাচূড়া গাছটা ওই যে জলের ধারের সেই কেয়াঝোপ।

ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল অঞ্জন।

সেই ঘাস। সেই জলরঙে সোনালী-লাল তেল রঙে—মেশামেশি। সুকোমল অঞ্জন আর সীমা প্রায়ই এসে বসত ওই চালু জায়গাটায়। ঘাসের ওপর। গান শিখতে যাওয়ার সময়, বা ফেরার পথে এখানে একটু না আড্ডা দিলে চলতনা ওদের। অঞ্জনের ভিতরটা হু হু করে উঠলো। কতদিন আগেই বা? কুড়ি, বাইশ বছর! একদিন সন্ধ্যায় ধরা ভারী গলায় সুকোমল গেয়েছিল—'আকাশ ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ!' সীমার মুগ্ধ দৃষ্টির কথা মনে আছে অঞ্জনের। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল সীমা সুকোমলের দিকে। তখনই অঞ্জন বুঝেছিল সীমা সুকোমলকে ভালোবেসে ফেলেছে।

এরই কয়েকমাস বাদে এরা হঠাৎ বিয়ে করে বসে। সীমার সংগে সুকোমলের পরিচয় হবার আগে আরো আগে যখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে অঞ্জন, তখন কলেজের ছাদে ওদের ঘরোয়া গানের জলসা বসত। গানের পর গান করে মাতিয়ে দিত সুকোমল। গম্ গম্ করে উঠতো ধ্বনি। ধ্বনি এত দূর উঠে যেত, যে মনে হতো, আকাশের চাঁদোয়া ছুঁয়ে, স্বর্গীয় মুক্তি মেখে ফিরে আসছে অমৃত মাখা সুরে। সুকোমলের সেই মুখ, সেই কাটা চিবুক, তীক্ষ্ণ নাক, আকর্ণ-বিস্তৃত চোখ, গিরিমাটির মত গাঢ় রঙ—সব মিলিয়ে এত ভালো লাগতো অঞ্জনের, এত ঈর্ষা হ'ত!

সত্যি বলতে কি এককালে অঞ্জন সমবয়সী সুকোমলের ফ্যান-ই ছিল সব সময় অঞ্জন আর সুকোমল এক সঙ্গে থাকত। তাদের দুজনের ঐ একত্র ছবিটি অনেকেই এখন ভুলে গিয়েছে। হঠাৎ ধপ্ করে একটা পুরোনো চিঠির ছবি ঘুরতে ঘুরতে উঠে এল অঞ্জনের মনে। ছোট বেলা মানুষ উচ্ছ্বাসের চোটে কত রকমই না বোকামি করে বসে। একবার দেওঘরে গিয়ে সুকোমলের জন্যে তার খুব মন কেমন করেছিল। মন প্রাণ খুলে সুকোমলকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলেছিল। কিন্তু কেন জানিনা ওই চিঠিটার কথা মনে পড়তেই তার ভিতর কেমন একটা অস্বস্তির বোধ জেগে উঠছে। চিঠিটা যেন একটা নীলবর্ণ খাড়ার মত, ওর কাঁধের উপরে ঝুলছে!

আজকাল কিন্তু ওই ধরণের থামোপা মন খারাপ, কিংবা অকারণ উচ্ছ্বাস টুচ্ছাস কিছুই যেন আর আসে না তেমন। গান টান গাইবার সময়. ইমোশনটাকে রুজি রোজগারের তাগিদে যেন জোর করে টেনে আনতে হয়।

মানুষের শরীরটা যেমন বাইরে বদলায়, তেমনি ভেতরে বদলায়। মানুষের শরীর থেকে নিত্য-নিয়তই পুরোনো কোষ খসে খসে পড়ে, আর নতুন কোষ সন্নিবিষ্ট হয়। পুরোনো কোষগুলোয় যে বিন্দু বিন্দু টলটলে ছেলেমানুষীর ফোঁটাগুলো থাকে—নতুন কোষে তার বদলে বোধহয় ঝানু বিষয় বুদ্ধি ঢুকে যায়। কে জানে?

অঞ্জন ড্রাইভারকে গাড়ি ঘুরিয়ে লেক-গার্ডেনস-এ ঢুকতে নির্দেশ দিল।

সুকোমল-রা লেক-গার্ডেনস্-এ চলে যাবার পর অঞ্জনের আর সুকোমলদের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কখনো সখনো দু-একটা ফাংসনে সীমা বা সুকোমলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এইমাত্র। পকেট থেকে সুকোমলের বাড়ির পেন্সিলে লেখা ঠিকানাটা বের করে নিল অঞ্জন। ড্রাইভারের হাতে দিল। এ অঞ্চলে ঠিকানার যা ঘোরপ্যাঁচ্! কয়েকবার লেক-গার্ডেনস্-এ এসেছে অঞ্জন। একবার এক ধনী আলোক-প্রাপ্তা মহিলার অনুরোধে। আর একবার বুঝি এক মস্ত জলসায়। আরও একবার। এক রেকর্ড কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তির অনুরোধে। হ্যাঁ পুরো জলসাটা ভিটেলে মনে পড়ে গেল অঞ্জনের। গান টান শেষ হয়ে যাবার পর, খাওয়া দাওয়া সেরে টাকার ভারী প্যাকেটটি পকেটে রাখতে রাখতে বেশ ভারিকী চালে প্রশ্ন করেছিল অঞ্জন—শুনেছি এ পাড়ায় গায়ক সুকোমল দত্ত থাকেন। তাকে এই জলসায় ডাকেন নি আপনারা?

—কে সুকোমল দত্ত স্যার? আমি তো ঠিক্···অসহায় মুখে প্রশ্ন করেছিল

একজন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সে সুকোমলের নামটুকু অবধি শোনেনি। আর একটি, কিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল গোছের ব্যক্তি বলেছিল, হ্যাঁ আগে নাম টাম কিছু কিছু শুনেছি। লোকটা খুব প্রাউড-টাইপের!

সেদিন অঞ্জন ভিতরে ভিতরে একটা অদ্ভুত উল্লাস বোধ করেছিল। সত্যি সুকোমল কিন্তু সব সময়েই একটু বড় বড় কথা বলতো। বাস্তবের চেয়ে যেন খানিকটা কিঞ্চিৎ বেশি ছিল সুকোমলের।

অঞ্জনের ড্রাইভার ঠিকানার কাগজটা নিয়ে পাগলের মত ঘুরছে। হদিশ মিলছে না সুকোমলের বাড়ির।

অথচ হু হু করে সময় যাচ্ছে!

অঞ্জন মনে মনে একটু বিরক্ত হ'ল। প্রায় বাড়তি দশ লিটার তেল খরচ হয়ে গেল তার। আশ্চর্য অথচ কত রকম রটনা অঞ্জনের সম্বন্ধে। সিনেমায় রেকর্ডে রেডিওতে, টিউশনিতে, ট্যুরে অঞ্জনের নাকি টাকা রাখবার জায়গাই নেই। কথাটা ঠিক পুরো সত্যি নয়। ধনীরও অভাব থাকে। বড়-মাপের অভাব। সে গুলোও ছোট মাপের অভাবের অবিকল সমান তীব্র, তা মানুষকে সহজে বোঝানো যায়না। সাফল্যেরও একটা নিজস্ব কান্না থাকে। মাঝে মাঝে গানের আসর গ্রামোফোন কোম্পানী, রেডিও ষ্টেশনের সফল রেকর্ডিং-এর পর কিংবা কোনো ট্যুরে যাবার বা ফেরবার সময় তার কেমন যেন হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু কেন করে, তা এখনো ভালো করে ধরতে পারেনি অঞ্জন।

ড্রাইভার শেষ পর্যন্ত একটা হদিশ করে ফেলতে পারলো।

সরু আঁকা বাঁকা রাস্তার মাঝ বরাবর বাড়িটা। বাড়িটার সামনে গোটা দুই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর কয়েকটি অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে। সম্ভবত সুকোমলের ছাত্রছাত্রী। গাড়ি দুটোকেও অঞ্জনের চেনা মনে হলো। একটা অলকা লাহিড়ীর, আর একটা সুধাংশু চক্রবর্তীর।

অঞ্জনকে দেখে সসম্ভ্রমে এগিয়ে এলো ছেলেমেয়েরা। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অঞ্জনকে। বাড়ির পিছনের দিকের একটা অংশে সুকোমলরা থাকে। সরু প্যাসেজ। প্যাসেজে ডাম্পের ঝাপ্‌সা গন্ধ। সুকোমল সামনের দিকে ফ্ল্যাট-টা নেননি কেন? প্যাসেজ পেরিয়ে উঠোন। উঠোনের একপাশে গাদা করা জুতো। ঘরের ভিতরের ভিড় ছাপিয়ে কিছু মানুষ বাইরেও দাঁড়িয়ে আছে। ডাম্প্‌ ওঠা ছাতা পড়া বাইরের দেয়ালের গায়ে হেলান দেওয়া

কয়েকটি সাইকেল। একপাশে রান্না ঘর। কল-ঘর। এ্যাসবেষ্টসের ছাউনি দেওয়া। দড়িতে গামছা ঝুলছে। দৃশ্যটা খুব পুরোনো দিনের দৃশ্য বলে মনে হলো অঞ্জনের। নতুন এ্যাপার্টমেনট্-এ যাবার পর থেকে, নাইলনের সুদৃশ্য লাইনার আর প্লাষ্টিকের ক্লিপ ও হ্যাঙ্গার ছাড়া সে অন্যকিছুতে কখনোই জামা কাপড় ঝুলতে দেখেনি। আর গামছা?—তার বাড়িতে চাকররাও আজকাল গামছা ব্যবহার করে না।

ভিতরে উঁকি দিতেই চোখাচোখি হ'ল সীমার সঙ্গে। সুকোমলের একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ধূপমাল্য দেওয়া ছবির পাশে সে হাঁটুতে হাত জড়িয়ে বসেছিল। পরণে তার তাঁতের একটা কোরা সাড়ি। সীমার চেহারাটা খুব একট বদলায়নি। সে তুলনায় অঞ্জনের বৌ বেশ মোটাসোটা ভারিক্কী হয়ে গেছে। অঞ্জনের সন্তান সন্ততির সংখ্যাও তিনটি। সুকোমলের বরং বেশ দেরী করেই ছেলে হয়েছিল। মাত্র বছর আড়াই আগে। সীমার চুল এলো করা। তার কোলের কাছে বসে ছোট্ট একটি শিশু। আপন মনে একটি ফুলের মালা নিয়ে খেলা করছে।

কেউ গান গাইছিল। রবীন্দ্র সংগীত। সবাই অঞ্জনকে দেখবার জন্যে ঘুরে তাকাল। অলকা অঞ্জনকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে এসে বলল, —এই যে, এসে গেছো, তোমার সংগে কথা বলব বলে বসেছিলাম দরজার কাছ ঘেঁষে।

চাপা গলায় অঞ্জন বলল, আমার সঙ্গে কথা বলবে বলে, না তাড়াতাড়ি কাটবে বলে?

অলকা দুষ্টু দুষ্টু মুখ করে হেসে বলল,—যাঃ!

তারপর অঞ্জনের পোষাক পরিচ্ছদগুলো আপাঙ্গে দেখে নিয়ে বলল,

—ফাংশনের পক্ষে কি আমার এই শাদা বেনারসীটা খুব 'পেল' লাগবে অঞ্জন?—কি করব, এখানে আসতে হলো!

—দেখো না এবারই প্রথম রবীন্দ্র-সদনে গান গাইবার চানস্ পেল সুকোমল, আর ঠিক এখনই···সত্যি কি স্যাড্ তাই-না? ইতিমধ্যে মোটাসোটা থলথলে চেহারার একটু বয়স্ক সুধাংশু চক্রবর্ত্তী রুমালে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে উঠে এলেন।

—ওঃ বড্ড গরম বসা যায়না, হাঁফ লাগছিল। অঞ্জন বলল,—পাঁচ মিনিট ওয়েট্ করুন, এক সংগে চলে যাবো। আপনি এসেছেন, খুব ভালো হয়েছে

সুধাংশুদা। আপনি ছাড়া সত্যি আমাদের এই গানের লাইনের কোনো শোক-সভা ভাবাই যায় না।

সুধাংশু চক্রবর্ত্তী পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন। শুধু শোক সভা! কি বলছ অঞ্জন! সীমার বাপের বাড়ি বহরমপুরে খবর পাঠানো থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই তো করলাম। তবে এত দুঃখের মধ্যেও সুখবর এই যে সীমার বাবা আর ভাইরা সীমাকে ওঁদের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন। পুরোনো মনো-মালিন্য সব কাটিয়ে আবার সব এক হয়ে গেল আর কি!

অলকা একটু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল, সীমা কি এখনো গান টান বজায় রেখেছে?

—হ্যাঁ, ওই-ইতো শেষের দিকে টিউশানিগুলো বজায় রেখেছিল। শুনেছি গান গাইতে সুকোমলের খুব কষ্ট হতো।

অঞ্জন প্রশ্ন করল,—ওই ছেলেটি···মানে ওই টুবালি তো, বেচারী কিছু বুঝতেই পারছে না।

ভিতর থেকে এতক্ষণে সীমা বেরিয়ে এলো। তার দুচোখে জল উপ্‌চে পড়ছিল অঞ্জনকে দেখে। অঞ্জন বুঝতে পারল সে নিমিত্ত মাত্র, সীমার চার পাশে এখন সেই পুরোনো দিনগুলোর স্মৃতিই ঝাঁক বেঁধে চলে এসেছে।

—অঞ্জন, এত দিনে এলে তুমি? এসো, ওর সুর দেওয়া একটা দুটো পুরোনো গান করো। কিংবা পুরোনো দিনের কোনো কথা বলো! প্রমাদ গুনলো অঞ্জন। একবার চকিতে ঘড়িটা দেখে নিল। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। সীমার সেই তারার মত ঝলমলে দুটি চোখ। দুটি আঁকা নিবিড় ভ্রূ। সেই নাকের পাতাটুকু একটু ফুলে থাকা একটি নাকচাবির বিঁধের ফুটো অঞ্জন বুঝতে পারল, শোকে দুঃখে সীমা হয়তো ভুলেই গেছে যে আজ রবীন্দ্র সদনে ওদের ফাংসন আছে। সেখানে যেতে হবে।

অলকা একটু গলা খাঁকরি দিতেই সীমা অলকার দিকে তাকিয়ে বলল,—তুমিও একটা গান গেয়ে যেও অলকা। ওর কাছ থেকে শুনেছি রেকর্ড কোম্পানীতে তুমিও খুব বন্ধু হয়েছিলে।

অলকা বলল, না, না, আমাকে আর কেন? বরং—অঞ্জন তুমি গাও, সীমা যখন এত করে বলছে তখন অন্ততঃ একখানা গানও গেয়ে দিয়ে যাও!

সীমা চাপা গলায় বলল,—এই তো, আজই শেষ। এই একটি বারই তো বলছি। আর তো নয়। তোমাদের যদি বা মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাত হ'ত।

এখন তো আর হবে না। আসল যোগসূত্রটাই যখন ছিঁড়ে গেল। আমি তো কিছুদিন পরেই টুঁবলুকে নিয়ে বহরমপুরে আমার বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি।

বাধ্য হয়ে অঞ্জনকে ভিতরে ঢুকতেই হল। তাকে দেখে রীতিমত একটা গুঞ্জন উঠলো ঘরে। কেউ যে অটোগ্রাফ্ চেয়ে বসেনি, এই তো যথেষ্ট। পিছন দিকে বসে থাকা কয়েকজন কিশোরী ক্রোশের মত গলা উঁচিয়ে তাকে দেখে নিল। অঞ্জন মিত্র যে সুকোমলের নিকট কেউ, বন্ধু বা আত্মীয় বা যাই-ই হোক,—এ ব্যাপারটা সকলেরই বেশ চোখে লাগছিল। অঞ্জন জানতো সুকোমল তার গলায় কোন কোন বাছাই করা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে ভালো বাসতো। সেই স্মৃতিটুকু মনে রেখেই সে গান ধরল—

আমার জীবন-পাত্র উচ্ছলিয়া
মাধুরী করেছ দান
তুমি জান নাই তুমি জান নাই
তার মূল্যের পরিমাণ।

এতক্ষণ সুকোমলের ছবির দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারছিল না অঞ্জন। একটা প্রায় পারিবারিক বিয়োগ-ব্যথা তাকে যেন অস্থির করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের গানটি কণ্ঠে নিয়ে পরিশুদ্ধ শোকে অঞ্জন এই প্রথম ছবির সুকোমলের দিকে সোজাসুজি তাকাল। ছবিটা সুকোমলের অল্প বয়সের। কিন্তু কেন? পরে সুকোমলের কোনো ছবি তোলা হয়নি? সীমাও কি অঞ্জনদের মত আগ্রহ হারিয়েছিল সুকোমল সম্বন্ধে। সেই অল্প বয়সের সুকোমল, প্রায় সেই বয়সের যে সময় সে সদ্য বিয়ে করে অকূল সমুদ্রে প্রায় হাবুডুবু খেয়ে বেড়াচ্ছে। সে সময়ে অঞ্জন সুকোমলদের ভবানীপুরের বাড়িতে খুব যেত। তিনজনে মিলে ভবিষ্যত নিয়ে কত আশা আকাঙ্খা কত জল্পনা কল্পনা। গান শেখা, গান গাওয়া, নতুন নতুন সুর নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট্ করা। গানের স্কুল করবার প্ল্যান করা। কত ছোটখাটো মান-অভিমান। কত কী। তখন সবে ওদের সকলের দৌড় শুরু হয়েছে। প্রথম রাউণ্ড্ ঘোরাও শেষ হয়নি। চোখে রঙীন স্বপ্ন, মন উচ্ছ্বাসে টলোমলো। অথচ নিজে অবিবাহিত বলে, বোকার মত ঈর্ষা করত সুকোমল আর সীমার দাম্পত্য-জীবনকে। সুকোমল গান গাইত, আর সীমা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত সুকোমলের মুখের দিকে। যেন এত রূপ সে এর আগে কখনো দেখেনি, এমন গান সে

এর আগে কখনো শোনে নি। অবশ্য সুকোমলের গায়কীতে, সুরারোপে সে অল্প বয়সেই বিশেষত্ব ধরা পড়েছিল। আর কেউ না মনে করুক অন্ততঃ বন্ধুরা তো মনে করতই, যে সে একটা বড়ো মাপের প্রতিভা। বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে আগে রেকর্ড বেরিয়েছিল ওই সুকোমলেরই। অথচ ··রজনীগন্ধা অগোচরে যেমন রজনী স্বপ্নে ভরে,—সৌরভে!

অত্যন্ত গলায় ওপর ওপর গান গেয়ে যাচ্ছিল অঞ্জন। তার চোখ ঘুরছিল কখনো সুকোমলের ছবিতে। কখনো সীমার মুখে। গান গাইছিল শুধু তার গলা। মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল সীমা। এই সব ভাসা ভাসা দৃশ্য দেখছিল তার চোখ। কিন্তু তার মনে ঘুরছিল ছবি। রীলের পর রীল। ক্রমাগত। কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডের পর কোথায় সেই সুকোমল? একটা ছবিতে সুর দিয়েছিল সুকোমল। ছবিটা সুপার ফ্লপ্ হয়। কিন্তু গানগুলোর মধ্যে নাকি অভিনবত্ব ছিল। হঠাৎ গান গাইতে গাইতে বুকের ভিতরটা খচ্ খচ্ করে উঠলো অঞ্জনের।

মানুষের মনের গতি—খুব সলিল। বেওয়ার থেকে একই সময়ে সে দুটো চিঠি লিখেছিল। একটা লিখেছিল দারুণ মন খারাপ হয়ে যাওয়ার বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর এক অঞ্জন। তার প্রাণের বন্ধু অভিন্ন হৃদয় সুকোমলের কাছে। আর একটা, এক রেকর্ড কোম্পানীর হর্তাকর্তার কাছে কিঞ্চিৎ তৈল প্রদান করে। মনের দুটি কি ভিন্ন গতি। অথচ ওই একই সময়ের দুটি চিঠিরই দুটি ভাবে কোনো তফাৎতা ছিল না। কোনো ফারাক ছিল না।

পরে কলকাতায় ফিরে অলকার সঙ্গে নিয়মিত গিয়ে গিয়ে ওই হর্তাকর্তাকে রীতিমত ভিজিয়ে ফেলেছিল অঞ্জন। সেই লোকটার নামই তো বিশ্ববাবু। যার কথায় শিল্পীরা মরে, আবার গজিয়ে ওঠে। কিসব গুঢ় কারণে যেন এই লোকটা সুকোমলকে তেমন পছন্দ করত না। কথাটা ভাবতে ভাবতেই মাথার ভিতর একটা পিনফোটানোর মত যন্ত্রণা অনুভব করল অঞ্জন। একটা অস্বস্তি, একটা অবোলা আতঙ্ক একটা বিস্বাদ কটুতা! সুকোমল বিশ্ববাবুর অনীহা জানত বলে নিজের গান একটা ক্যাসেটে তুলে অঞ্জনকে দিয়েছিল। অঞ্জন,—কি জানি? বোধহয় হারিয়েই ফেলেছিল ক্যাসেটটা।

গান তখন মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে। দরদ ভরা গলায় অঞ্জন গাইছিল,

বিদায় নেবার সময় এবার হল
প্রসন্ন মুখ তোলো, মুখ তোলো মুখ তোলো।
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া সঁপিয়া যাবো প্রাণ.....

সীমা তার মাথাটি দু হাটুর মধ্যে গুঁজে রেখেছে। তার সরু শাদা সিঁথিটার দুপাশে এলোমেলো রুক্ষ চুল উড়ছে। অলকা তার কিউটেক্স্ লাগানো লম্বা লম্বা আঙুলগুলো সান্ত্বনার ভঙ্গীতে সীমার মাথায় রেখেছে। তার মুখের রেখায় কোনোরকম চাঞ্চল্যের ছাপ নেই, অথচ ইশারায় অঞ্জনকে দেখিয়ে দিয়েছে, ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা। দরজার মুখ থেকে সুধাংশু চক্রবর্ত্তীও ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে আর চোখ ইশারা করছে অঞ্জনকে।

গান শেষ করতে অঞ্জনের মনে পড়ল অভাব কষ্ট, মান অভিমান করতে করতে সীমাও একসময়ে সুকোমলের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল। দারিদ্র্যের জ্বালা অসহ্য হয়ে উঠতে সে মফস্বলের একটি স্কুলে চাকরি নিয়ে চলেও গিয়েছিল একবার। সুকোমল তখন গানটান ছেড়ে দিয়ে পাগলের মত ঘুরত। বলত,—লাইন পালটাবো এইবার!

সীমা কি সত্যিই সুকোমলকে ভালো করে দেখেনি? কে জানে? এমনও হতে পারে বহুদিন সন্তান হয়নি বলে ওদের কোনো গোপন দুঃখ ছিল। ছেলেটা জন্মাবার পর গত দুবছর তার নাম আবার টুকটাক করে শোনা যাচ্ছিল। আবার নিজের লাইন, গানকে আঁকড়ে ধরেছিল সুকোমল। কিন্তু ততদিনে অলকা চন্দন সুজয়, সজল, রুপেন অনেকগুলো পাক খেয়ে অনেক হার্ডল ডিঙে বহুদূর, নাগালের বাইরে এগিয়ে গেছে। বড্ড সময় নষ্ট করেছিল সুকোমল। বড্ড সময়।

প্রসন্ন মুখ তুলে এখন ফটোর ভিতর থেকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সুকোমল। এখনি যেন বলে উঠবে—যাচ্ছিস?

কিন্তু সীমা। গান শেষ হয়ে গেল। তাও সে তার প্রসন্ন মুখ তুলল না।

এবার উঠেই পড়ল অঞ্জন। ভিড় কেটে বেরিয়ে এসে জুতোয় পা গলালো।

সুধাংশু চক্রবর্ত্তী অশৈরণ কণ্ঠে বলল,—কি অত দেরী করছো? চলো, চলো, একটা শোক প্রস্তাব নিতে হবে না? বাঃ, চমৎকার! ভাবল অঞ্জন। আইডিয়াটা তার মাথাতেই আগে আসা উচিত ছিল।

সীমা বাইরে এলো।

—আজ শেষ পর্যন্ত রইলেনা অঞ্জন। ওর ছাত্রছাত্রীদের কাছে কিছু পুরোনো দিনের কথা বলতে।

ঘড়ির দিকে একবার তেরছা করে তাকিয়ে নিয়ে অঞ্জন বলল,—কি বলব সীমা! আজ আর পারছিনা।

সীমা মাথা নাড়ল। হঠাৎ অঞ্জনের মনে পড়ল একবার এক গানের আসরে সীমা অঞ্জনের সংগে একটা কথাও না বলে চলে এসেছিল। তার বন্ধুর ধারণা সে আর সুব্রত সুকোমলকে নিয়ে যেসব আলোচনা করছিল, তার অন্তত কিছু কিছু অংশ সীমার কানে গিয়ে থাকবে। আজ এখানে আসার পর থেকে যে কথাটা মনে এলেও আসছিল না, সেটা হঠাৎ মনে পড়তেই অঞ্জন অলকা আর সুধাংশুকে বলল,—আপনারা চলে যান সুধাংশুবাবু, আমি সীমার সঙ্গে একটু কথা বলে, মিনিট পাঁচেক বাদেই রওনা হচ্ছি।

অলকা বলল,—আমরা না হয় মিনিট পাঁচেক বাইরেই দাঁড়াচ্ছি। তুমি সীমার সংগে কথা বলবেতো! —ঠিক আছে। বলেই এসো।

সীমা তারার মত উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে অঞ্জনের দিকে তাকালো।

—কথা বলবে? এসো এ ঘরে।

সুকোমলের শোবার ঘরটিকে কিন্তু মনে মনে ঈর্ষা করল অঞ্জন। তক্তপোষ পাতা, শাদা ধব ধবে বিছানা। টেবল। আর তার ওপরে রাখা হারমোনিয়াম। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটি মস্ত বড় ছবি। ঘরে একটি ছোট দেয়াল ছাড়া আজ কোনো আসবাব নেই।

চোখ জুড়িয়ে গেল অঞ্জনের। নীচু গলায় সে বলল,—সীমা তোমাদের কাছে অনেক অপরাধ করেছি। ক্ষমা কোরো। আজ রবীন্দ্র সদনে আমরা···

সীমা মাথা নেড়ে বলল,

কি আশ্চর্য, জানো অঞ্জন। শেষের দিকে ও আবার গাইতে পারছিল। গলায় আর তেমন ব্যথা পেত না। তোমরা তো আসতে না কেউ। বড্ড একা হয়ে গিয়েছিল ও। টুবলু একটু হাঁটতে শিখতেই গলার অত কষ্ট নিয়েও মোড়ের চায়ের দোকানে গিয়ে বসত। ছেলে ছোকরাদের সংগেই আড্ডা দিত।

—সত্যি, কত যাওয়া আসা চিঠিপত্র, সব মনেপড়ে যাচ্ছিল আজ!

অঞ্জন একটু হেসে থেমে হালকা সুরে বলল—আচ্ছা সীমা অনেক কাল আগে দেওঘর থেকে আমি ওকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। সেটা বোধহয় এখন আর নেই, তাই না?

সীমার চোখের তারা দুটিতে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ স্ফুরণ হ'ল। কি যেন ভেবে নিয়ে সে বলল,—নাঃ, নেই।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অঞ্জন। একপাতা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর যাদের সম্বন্ধে আবোল তাবোল নিন্দে করেছিল, যাদের মুখোশ খুলে দিয়েছিল, তারা এখন

মস্ত মস্ত মানুষ। চিঠিটা সেই জন্যেই বিপজ্জনক।

ইতিমধ্যে মাকে খুঁজতে খুঁজতে ঢুকে পড়েছে টুবলু। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সীমা কেমন করুণ হয়ে গেল। দু-হাত দিয়ে তুলে নিল সে ছেলেকে।

অঞ্জন বলল,—সুকোমলের কোনো টেপ আছে?

যদি দিতে, আজ রবীন্দ্র সদনে বাজাতাম।

অঞ্জন দেখল সীমার মুখের রেখাগুলো ক্রমশ কঠিন হয়ে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। খস খসে গলায় সীমা বলল,

—ওর—টেপ—ওর—ভয়েস!

আস্তে আস্তে দেরাজটা খুলল সীমা। অঞ্জন দেখল ভিতরে থরে থরে ক্যাসেট সাজানো আছে। আর চিঠি পত্র কাগজের তাড়া। সীমা কাগজের তাড়া থেকে একখানা চিঠি বের করে বলল,—তোমার দেওঘর থেকে পাঠানো এই চিঠিটা ও হারায়নি অঞ্জন। রেখে দিয়েছিল। মাঝে মাঝেই দেখত। এটা বরং তোমার নিয়ে যাওয়াই ভালো। আমাদের কাছে আর এটার কোনো মূল্য নেই। অঞ্জন হাত বাড়িয়ে প্রায় লোভীর মত চিঠিটা ছিনিয়ে নিল।

সীমা তার ছেলেকে বুকে চেপে ধরে বলল, কিন্তু ক্যাসেট?—না ক্যাসেট আমি তোমায় দেবনা অঞ্জন। একবার তুমি ওর 'ভয়েস' হারিয়ে ফেলেছিলে।

মাথা নিচু করে অঞ্জন গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সুধাংশু চক্রবর্তী আর অলকা ফুটপাথে অস্থির পায়চারী করছিল।

সুধাংশু বলল,—তাহলে শোক প্রস্তাবটা কে নিচ্ছে? তুমি না আমি?

কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে অঞ্জন বলল,—যা দেরী হয়ে গেল, দেখুন ইতিমধ্যে হয়তো সুজয়রাই নিয়ে বসে আছে। নিজের গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল —চালাও রবীন্দ্র সদন।

সেতুর ওপর দিয়ে গাড়িটা যখন হু হু করে ছুটছিল অঞ্জন তখন তার সব দুর্বলতা সব আবেগ, সব কম বয়স সব ক্রোধকে কুঁচি কুঁচি করে উড়িয়ে দিল জানলার বাইরে।

উড়ন্ত টুকরোগুলো মাটি ছোঁবার আগেই গাড়িটা লেক ছাড়িয়ে সাদার্ন এভিনিউ-এ পৌঁছে গেল।

শ্বেতী

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জায়গাটাকে নীলাঞ্জনের বেশ নতুন নতুন লাগছে। বিশ বছর আগে রাস্তাঘাট যে রকম ছিল, এখনও সেই রকমই আছে। তবে কিছু কিছু কাঁচা রাস্তা হয়তো পাকা করা হয়েছিল, এখন সেই সব রাস্তার চটা উঠে গেছে, জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে গেছে। ভরাট করার কোনো চেষ্টা হয়নি। যেখানে ফাঁকা খেলার মাঠ ছিল সেখানে অসংখ্য নতুন নতুন বাড়ি হয়েছে। পুরোনো সাবেক আমলের বাড়ি এই বিশ বছরে আরো শ্রীহীন হয়েছে। বড় রাস্তার দুধারে এমন কি গলি ঘুঁজিতেও অসংখ্য দোকান হয়েছে। বেশির ভাগই জামা কাপড়ের, বইয়ের। কিছু স্টেশনারি, মুদিখানাও হয়েছে। নতুন নতুন মিষ্টির দোকানও গজিয়ে উঠেছে। মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকান, পান, বিড়ি, সিগারেট। নীলাঞ্জনের নিজের বয়স যেমন বিশ বছর বেড়েছে, জায়গাটারও বয়স বিশ বছর বেড়েছে। পান দোক্তা খাওয়া প্রাচীন দাঁতের মত চেহারা হলেও নীলাঞ্জনের বেশ ভালই লাগছিল। যতই হোক তার জন্ম এখানে, ছাত্র জীবন কেটেছে এখানে। কর্মসূত্রে মধ্য প্রদেশের গভীর অরণ্যে সম্বর কিম্বা হাতীর সঙ্গে বিচরণ করলেও প্রতি মুহূর্তে এই ঘিঞ্জি, অসংখ্য মনুষ্য অধ্যুষিত, বহু প্রাচীন এই সহরের জন্যে তার প্রাণ কাঁদত।

নীলাঞ্জনের তিন কূলে কেউ নেই। কোনো জীবিত আকর্ষণ নেই। তবু নীলাঞ্জন বিশ বছর পরে হঠাৎ একটা ছুটির আমেজ মেখে দিল্লী দিল্লী না গিয়ে এখানে ছুটে এসেছে। এই ধরণের সহরে হোটেল থাকেনা, ধর্মশালা নেই, নীলাঞ্জন দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছে। এদের কলতলায় অনেক স্যাওলা জমেছে। নীচের পুরোনো ভাড়াটে উঠে গেছে। নতুন যাঁরা এসেছেন নীলাঞ্জন তাঁদের চেনে না। বাইরের দিকে কেশববাবুর সোনা-রূপোর দোকান ছিল। পনের বছর আগে কেশববাবু মারা যাবার পর দোকান উঠে গেছে। সেই ঘরে গত পনের বছর ধরে হরেক ব্যবসার খেলা চলতে চলতে এখন দর্জির দোকান হয়েছে। মহিলা পরিচালিত। অধিকারিনী পাড়ার সকলের মেজদি। দোকানের নাম মেজদি টেলার্স।

বিশ বছর আগে এই বাড়িরই কত জাঁক জমক ছিল। বছরে বছরে বাড়ি

রং হত। ঝকঝকে উঠোনে টবে টবে পাম আর পাতা বাহার গাছ ছিল। এই বাড়ির বড় মেয়ে সুষমা সন্ধ্যে বেলা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইত। সুষমার মা যাকে নীলাঞ্জন বৌদি বলে ডাকত, তাঁর হাসির আর সে ধার নেই, রংয়ের আর সে জৌলুস নেই, শরীরের আর সে বাঁধন নেই, চুলের আর সেই সুচিক্কন চঙ নেই। সুষমার সেই চকচকে হারমোনিয়াম, কীটদষ্ট হয়ে ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। সুষমা নেই। দশ বছর আগে এক শীতের রাতে সে কিসের বেদনায় আত্মহত্যা করে জীবনটাকে পাখির মত উড়িয়ে দিয়েছে। সুষমার বাবা যাকে নীলাঞ্জন পরেশদা বলে তিনি রিটায়ার করেছেন। জীর্ণ শরীরে বৃদ্ধ এখন উত্তরের বারান্দায় সারাদিন বসে থাকেন। পুরোনো আমলের মাসিক পত্র পড়েন। কখন ঘুমিয়ে পড়েন। আবার জেগে ওঠেন। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একটা অস্পষ্ট জগতে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছেন।

বিশ বছর পরে নীলাঞ্জন এসেছে যেন সময়ের শিকারী। পরিচিত জনেরা এখন কোথায়? যখন যার কথা মনে পড়ছে, সময়ের অতল জলে তাকেই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে। নীলাঞ্জনদের বাড়িতে একজন ডাকসাইটে রাঁধুনী ছিলেন বামুনদি। নীলাঞ্জনের মা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মহিলাকে নিজে হাতে রান্না শিখিয়ে পাকা রাঁধুনী করেছিলেন। কোথায় সেই বামুনদি। খুঁজে খুঁজে বের করল নীলাঞ্জন। শেষ যাদের বাড়ি কাজ নিয়েছিল তাঁদেরই বদান্যতায় কোন রকমে বেঁচে আছে। গ্যারেজে গাড়ি নেই। এক সময় ছিল। সেই গ্যারেজে একটা কুকুর আর শতছিন্ন বিছানায় বামুনদি। নীলাঞ্জন অনেকক্ষণ মাথার কাছে বসে রইল। হুঁস নেই কোনো। একটা এনামেলের মগে খানিকটা আটাকা বার্লি। একটা টিনের কৌটোয় দোক্তার মাজন একটু। চিট বালিসের পাশে ছোট্ট একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি। বালিসের তলায় বামুনদির সেই বিশ বছরের সঙ্গী ফ্রেমে বাঁধানো ধূসর একটা ছবি—তার স্বামী।

মাথার কাছে বসে থাকতে থাকতে জরাজীর্ণ এই মহিলার শরীর দেখতে দেখতে নীলাঞ্জন কত সহজে তার শৈশবে ফিরে গেল। তাদের সেই দো-মহলা বাড়ি। একান্নবর্তী পরিবার। মা জ্যাঠাইমা, বাবা, জ্যাঠামশাই। উত্তর মহলের দো-তলায় রান্না ঘরে, মুখে পানের খিলি পুরে বামুনদি মাংস রাঁধছে। সারা বাড়ি গন্ধে মাতোয়ারা। দক্ষিণ মহলের বাইরের ঘরে গানের আসরে পুলীন বাবুর সুরের মায়াজাল। বাদ-থাবা ঝকঝকে খাটে ঈষৎ অসুস্থ মা পা মুড়ে বসে। দেয়ালের আয়নায় ঘরের আলো ঝলসাচ্ছে। দেয়ালে তেল রঙে আঁকা

ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হাতে ঠাকুর্দা গম্ভীর মুখে তাকিয়ে আছেন। লাল চকচকে মেঝেতে পাপোসের উপর একটা লোমওলা বেড়াল লেজ গুটিয়ে শুয়ে। বামুনদির শরীরে তখন কি অসাধারণ শক্তি। হাতে তখন রান্নার কি স্বাদ!

হাপানীর কাসি। বামুনদি উঠে বসল। এই সেই মুখ। দাঁত নেই। গাল ভেঙে গেছে। চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা। চোখের মনির উপর মাকরসার জালের মত অস্বচ্ছ আবরণ। নীলাঞ্জনকে চিনতে পারে নি। তখন মার মৃত্যুর পর নীলাঞ্জনকে সেই কোলে পিঠে মানুষ করেছে। সময় বোধ হয় স্মৃতিকে সমাধি দিয়ে দেয়। নীলাঞ্জনকেই চেনাতে হল। কাসির ধমক শেষ হতেই। বৃদ্ধার সে কি আনন্দ। কখন চুলে হাত বোলায়। কখন দু হাতের শীর্ণ মুঠোয় হাত দুটো ধরে। বালিসের পাশে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে ছোটো ন্যাকড়ার পুটলিটা বের করল। কাঁপা কাঁপা হাতে গেরো খোলার আপ্রাণ চেষ্টা। পেরেছে খুলতে। ময়লা একটা এক টাকার নোট বের করে দীর্ঘ শ্বাস টানতে টানতে ঘড় ঘড়ে গলায় বলল—কতদিন পরে এলি। আমার আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। একটু মিষ্টি কিনে খাস।

হাতে ময়লা নোট। বৃদ্ধার শেষ সম্বলে তার মিষ্টি মুখের ব্যবস্থা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নীলাঞ্জনের চোখের সামনে ভেসে উঠল অরণ্যের গভীরে বিশাল বিশাল শুষ্ক গাছের ফাঁকে একটি নীল জলাশয়, সম্বরের পায়ের খুরের আওয়াজ। জল খেতে এসেছিল। জলাসয়ে বাঘের ছায়া দেখে ছুটচে। সম্বরের বাঘ ওৎ পেতে আছে। শরীরের জলাসয় ছেড়ে যৌবন ছুটচে ছুটচে।

টাকাটা হাতে নিয়ে নীলাঞ্জন বিব্রত। কি করবে সে। বৃদ্ধা কখন মাথায় হাত বুলোচ্ছে। কখন হাত দুটো চেপে ধরছে। বহু প্রাচীনকালের জীবনের ঘ্রাণ নিতে চাইছে। নীলাঞ্জনের মাকে মনে পড়ছে। নীলাঞ্জনের বাবা ছোটবাবুর অফুরন্ত জীবনী শক্তির কথা মনে পড়েছে। সমস্ত অতীতটা যেন অশ্রু হয়ে দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। নীলাঞ্জন এখন কি করবে। তার ফেলে আসা নিজের অতীত একটা শীতল সরীসৃপের মত গা বেয়ে উঠে আসছে। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের মত একটা চকচকে শরীর ছিল এই বামুনদির। মার মৃত্যুর পর ওই বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে কত রাত কত দ্বিপ্রহর সে কাটিয়েছে। এখন যেখানে ছড়ির মত দুটি শীর্ণ স্তন ঝুলছে এক সময় সেই স্তনের উপর তার মুখ চেপে ধরে বামুনদি বলত খা, খা, খেয়ে দেখ মিষ্টি। এখন যে বুকে কফের উদ্বেগ এক সময় সেই বুকে কান পাতলে পরিষ্কার দুটো

কুসমুসে অরণ্যের সুস্থ বাতাসের মত সাঁ সাঁ শব্দ শোনা যেত। নীলাঞ্জন যখন অসুস্থ হত বামুনদিই তখন দুহাতে সেবা করত। কোনো প্রত্যাশা নেই। শুধু চোখের দেখা দেখেছে, তাইতেই বৃদ্ধার কি আনন্দ। সে জানে এই গ্যারেজেই সে ভাঙা গাড়ির মত পড়ে থাকবে। শেষ চাকরির বাবুর বদান্যতায় এই এনামেলের ভাঙা মগে একটু বালি আসবে। মৃত্যুর পদধ্বনি সে শুনেছে। প্রহরীর মত থাবার মুখ রেখে বসে থাকবে তার শেষ সঙ্গী এই পথের কুকুর। চাঁদিনী রাতে তাদের হারিয়ে যাওয়া বাড়ির ছাতে এই বামুনদি যখন খিল খিল করে হাসত তখন তার যৌবন ছিল, প্রাণশক্তি ছিল।

নীলাঞ্জনের নাকে এখন গন্ধ লাগছে। কফের শব্দে তার গা ঘুলিয়ে উঠছে। ওই শীর্ণ বুকে সে মাথা রাখতে পারবে না। ওই ঠোঁটে সে মুখ ঠেকাতে পারবে না। পয়সার অভাব নেই, একজন ডাক্তার সে ডাকতে পারে। চিকিৎসা হতে পারে। সেবা হবে না। একশো টাকার একটা নোট সে মাথার কাছে রেখে যেতে পারে। ভাল বিছানা সে একটা করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আর কদিন! দিন চলে যায় দ্রুত পায়। চায়না। সে কিছুই চায়না। পৃথিবীতে এক দল শুধুই দিতে আসে। তারা চায়না বলেই প্রার্থীর কলঙ্ক তাদের স্পর্শ করে না। আর দেখা হবে না। অনেক অনেক বছর পরে নীলাঞ্জন যদি আবার কখন ফিরে আসে, এই দৃশ্য তার জন্যে আর অপেক্ষা করে থাকবে না।

বাস তখন ছাড়ে নি। নীলাঞ্জন জানালার ধারে বসে অন্যমনস্ক সিগারেট খাচ্ছে। পুরোনো সহরে সে নবীন কিছুই খুঁজে পেলনা। সবাই এখানে স্থবির। কেউ তাকে গ্রহণও করল না আবার ত্যাগও করল না। সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। মানস সে দিন তাকে চিনেও চিনল না। শৈশবের সঙ্গী। এখন বড় ব্যবসায়ী। গাড়ি হয়েছে। বাড়ি হয়েছে। তার একটা নিজের জগত হয়েছে। তার কাছে পুরোনো কোনো কিছুর মূল্য নেই।

দেবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সারাটাক্ষণ সে শুধু নিজের জীবনের অসংখ্য ভুলের কথা বলে গেল। তার সংসার করা ভুল হয়েছে। তার একাধিক সন্তান সন্ততি তার ভুলের মাশুল। অথচ আশ্চর্য জীবন আবার নতুন করে শৈশব থেকে শুরু করা যায় না। অতীত মানুষকে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করে, বর্তমান অতীতের শক্তি হাতে নিয়ে মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয়। দেবুর মুখে সাতদিনের বাসি দাড়ি। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি। বগলে বিবর্ণ

ছাতি। জীবনটা তারা একসঙ্গে শুরু করেছিল। শৈশব গোমুখী থেকে অসংখ্য জীবন নদী অসংখ্য খাতে প্রবাহিত। কোথাও আনন্দ প্রবাহ কোথাও দুঃখ। নীলাঞ্জন যেন নিয়তিকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করল।

দূরে ওই ফুটপাথের ওপর দিয়ে কে যাচ্ছে, মনীশ না? মনীশই তো। সারাগায়ে শ্বেতী। নীলাঞ্জন একটু ইতস্তত করল। ডাকবে কি? মনীশ তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিল। নীলাঞ্জন অবশেষে ডাকল—মনীশ, মনীশ। মনীশ তার ছাবকা, ছাবকা মুখ তুলে অসহায়ের মত তাকাল। নীলাঞ্জনের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও হল, কিন্তু চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না। নীলাঞ্জন জানালা দিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে মনীশকে ডাকল। মনীশ ভয়ে ভয়ে পায়ে পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে এল। মনে হল, মানুষকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। মনে হল ইদানিং তাকে কেউ বড় একটা ডাকে না। মনীশ তার বিবর্ণ মুখ তুলে নীলাঞ্জনকে চেনার চেষ্টা করল। চিনতে পেরেছে অবশেষে নীলু না, নীলু তুই! নীলাঞ্জন তার বসার জায়গায় ব্যাগটা রেখে তাড়াতাড়ি নেমে এল। বাস ছাড়তে এখন দেরি আছে। মনীশ আবেগে তার হাত দুটো ধরতে গিয়েও ধরল না, একটু ইতস্তত করে নামিয়ে নিল। নীলাঞ্জন বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে সে তার সমস্ত দ্বিধা ফেলে মনীশের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল—কেমন আছিস?

দেখতেই পাচ্ছিস! আমার মৃত্যু হয়েছে।

নীলাঞ্জন কথাটা বিশ্বাস করল কিন্তু আমল দিলনা—এতে ছোঁয়াচে কিছু নেই, পুরোটাই মনস্তাত্ত্বিক। মনীশ মুখ নীচু করে বলল, পৃথিবীতে কুৎসিতকে কেউ চায় না। জানিস তো সাদা চামড়াদের দেশে কালো চামড়াদের কোনো সামাজিক অধিকার থাকেনা। আমাদের কালো চামড়াদের দেশে এই সাদা চামড়াও তেমনি ত্রাত্য।

নীলাঞ্জন মনীশের কথার কোনো গুরুত্ব দিল না—ও সব কথা রাখ। কি করছিস? মাড়োয়ারীর গদীতে খাতা লিখি, যা পাই একটা পেট চলে যায়। তুই কি করছিস? তোর স্বাস্থ্য আগের চে অনেক ভাল হয়েছে। বিয়ে করেছিস? করিসনি। তুই করিস নি। আমাকে কেউ করে নি।

বাস ছাড়ার বাঁশি বাজল। নীলাঞ্জন দু হাত দিয়ে মনীশের দু হাত ঝাঁকিয়ে বলল—চলি আমি। আবার হয়তো দেখা হবে কোনো দিন।

মনীশ ঘাড় নীচু করে রাস্তার একপাশ দিয়ে যে ভাবে হাঁটছিল সেই ভাবেই হেঁটে চলল, যেন অনন্ত কালের পথিক।

এই মনীশ ছিল. বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে প্রাণ চঞ্চল, অফুরন্ত জীবনের প্রতীক।

মনীশ বলছিল সামাজিক অনুষ্ঠানে পংক্তি ভোজনে আমার পাশে কেউ বসতে চায় না। কোনো মা তার শিশুকে আমার কোলে দিতে চায় না।

পরেশদা বলছিলেন. মধ্য প্রদেশ, সে জায়গাটা আবার কোথায় ? ঘুরেছি অনেক কিন্তু এখন আমার আর কিছু মনে থাকে না।

বৌদি বলছিলেন জীবনে অনেক হেরেছি নীলু, এখন আমার কান্নার সময়। দেবু বলছিল এর পরেরবার যখন আসবে তখন এবারের ভুল আর করবে না। বামুনদি বলছিল শেষকালে আর একবার আসবি তো।

পাহাড় আর জঙ্গলের পাশ দিয়ে ট্রেন চলেছে। নীলাঞ্জন পালাচ্ছে। আরো কিছু দিন ছুটি ছিল হাতে। বৌদিদের নোনা ধরা প্রাচীন বাড়িতে আরো কয়েকটা দিন মাথার তলায় হাত রেখে ছাদের ঝুলের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে পারত। তার ছেড়ে আসা সহরে সময়ের বদ্ধ জলাসয়ে যারা গলা ডুবিয়ে আছে রূপকথার রাজকন্যার মত তাদের শরীর ক্রমশই কুৎসিত হয়ে উঠছে। যে অরণ্যের সে বনবাবু সেখানেও সময় চলছে দিন যাচ্ছে রাত আসছে। বৃক্ষের সারি ক্রমশ উর্ধে আরো উর্ধে মাথা তুলছে তলার দিকের কাণ্ডে পুরু শ্যাওলা জমছে। কাল যে পশুর দল জলাসয়ে জলপান করেছে আজ হয়তো তাদের অনেকেই আসবেনা ; কিন্তু এখানে জীবনের সুর এক গতি এক। বৃক্ষ, পাখি, প্রান্তর, পর্বত, সম্বর, বরাহ, ব্যাঘ্র, এমন কি অরণ্যচারী মানুষ হাতে হাত ধরে একই গতিতে ক্রমশ ধূসর হচ্ছে। ফেলে আসা সহরে সে যা দেখেছে তার চেহারা অন্য। সেখানে একটা অংশে পক্ষাঘাত, আর, একটা অংশ বিকৃত ভাবে নড়ছে। সময় তার রঙ আর তুলি নিয়ে মনীশের মুখের মত সকলের মুখই অদৃশ্য হাতে কলঙ্ক চিহ্ন এঁকে চলেছে।

এরপর যদি কখন ফিরে আসি, নীলাঞ্জন মনে মনে বলল, পরিচিত জনের মধ্যে আর ফিরতে চাইনা। যারা পড়ে আছে তারা যখন সাগরে হারিয়ে যাবে, তখন এক অপরাহ্নে একেবারে নতুনদের মাঝে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ফিরে আসব।

বন্দুকের শব্দ হল। পাহাড়ের সানুদেশে আন্দোলিত বৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে নীলাঞ্জন বলল, পাগলা হাতীর দল বেরিয়েছে। এই রাতে তার বাংলোর খোলা মাঠে মৌল খেয়ে কিরাতেরা নাচছে। এই কদিনে আরো কিছু ঘাস বেড়েছে। বেতের চেয়ারে আরো এক পুরু ধুলো জমেছে।

সময় তুমি 'মৌল্' খাওয়া কিরাত। সময় তুমি পাগলা হাতী। সময় তুমি শীতল সরীসৃপ। সময় তুমি মনীশের মুখের বিবর্ণ শ্বেতী।

রঙ্গমঞ্চ

দিলীপ সেন

এত বড় যাত্রা উৎসব এ অঞ্চলে এই প্রথম। মিশনারী স্কুলের সারাটা খেলার মাঠ ঢেকে বিরাট সামিয়ানা পরেছে। স্থানীয় অঞ্চল-প্রধান থেকে সুরু করে বিডিও এসডিও মায় জেলা শাসক পর্যন্ত প্রায়-সন্ধ্যায় জিপে করে পরিবারসহ যাত্রা দেখতে আসছেন। কোলকাতা থেকে এসেছে কয়েকটা দল। তারমধ্যে একটি দল আমন্ত্রিত। তাদের থাকার জন্ত ব্যবস্থা হয়েছে ওই মিশনারী স্কুলেরই ঘরে। গ্রামের লোকের মধ্যেও অদ্ভুত সাড়া পরেছে। হাটে বাজারে চায়ের দোকানে সর্বত্র একই আলোচনা—সমালোচনা। কোন্ দল ভাল করছে, কোন্ দল কাস্ট পেরাইজ পাবে, কোন্ দলের হিরোইন বেশী সুন্দরী, কোন্ দলের বিবেকের গলা কত দরাজ।

বিরাট স্কুল বাড়ী। বিরাট চত্বর। মাঝখানে খেলার মাঠ। ওপাশে একটা বড় পুকুর। দোতলায় এক লাইনে স্থান পেয়েছে কোলকাতার দল। আরেকলাইনে কর্মকর্তার দল।

দলের অভিনয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু এক বিষয়ে সবাই একমত এরকম বিশাল আয়োজন ইতিপূর্বে আর হয়নি। বুধেরা সংযোজন করছে, আর কোনদিন হবেও না।

প্রতিযোগিতায় আসলে দুটি দলেরই নাম সর্বাগ্রে। সবারই মুখে-মুখে। দুটি দলই আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছে এবং এদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা। দুটো অনুষ্ঠানই হচ্ছে চ্যারিটি। উদ্দেশ্ত শিল্পীদের সাহায্য। দুটি দলের একটি কোলকাতার এবং অপরটি স্থানীয়। কোলকাতার দলটি ইতিমধ্যেই সর্বজন-বিদিত এবং এদের প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে প্রায়-সবাই নিঃসন্দেহ। এদের হিরোইন জয়ন্তীকুমারীর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ও শ্রেষ্ঠা কণ্ঠ-সংগীত শিল্পী হিসেবেও প্রথম স্থান সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ। জয়ন্তীকুমারীর নাম কে না শুনেছে? কে না দেখেছে খবরের কাগজে ওর ছবি? গ্রামের লোকের মধ্যেও যারা নাটুকে-পাগল এবং কলকাতায় যাতায়াত আছে তারা প্রায় সবাই জয়ন্তীকুমারীর অভিনয়ে মুগ্ধ তাদের মুখে মুখেই জয়ন্তীকুমারীর নাম গ্রামের সর্বত্র বিজ্ঞাপিত।

অপরপক্ষে স্থানীয় দল কিন্নরী অপেরার হিরো সম্বন্ধেও অনেকে আস্থাবান। এমন সুগঠিত দেহ, ছ'ফিটের একটু ওপরেই হবে উচ্চতা প্রতিটি অবয়ব এমন সবল এবং দৃঢ় যে সবটুকু মিলিয়ে মিশিয়ে কন্দর্পকান্তি আখ্যা দেওয়া যায়। গ্রামবাসীর গর্ব এই হীরককুমার! কেউ কেউ প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে দুঃখ করে আমাদের হীরু যদি সিনেমায় চান্স পেত তবে নির্ঘাৎ হিরো হতে পারত।

অন্যান্য দলগুলির অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। এখন বাকী আছে কেবল এই দুটি দলের অভিনয়। প্রতিযোগিতার বিষয় শুধু অভিনয়েই সীমাবদ্ধ নেই এই দুই দলের মধ্যে, ক্রমশ সেটা বেড়ে ছড়িয়ে পড়ল নানা শাখা-প্রশাখায়। কিন্নরী অপেরার দল সাইকেল রিক্সায় মাইক বসিয়ে বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল ছড়াতে লাগলো, ভৈরব অপেরা ভাড়া করলো ঘোড়ার গাড়ী। প্রপাগাণ্ডার সংগে চলতে লাগল পুরনো ঐতিহ্যের গরিমা। ঘোড়ার গাড়ীর ওপরে আবার ছোটখাট একটা কনসার্ট পার্টি। তারা ব্যাগপাইপের সংগে ড্রাম বাজিয়ে লাল নীল রঙের প্যামফ্লেট ছড়িয়ে বেড়াতে লাগল গ্রামময়। সেই দেখে কিন্নরী অপেরা সংগ্রহ করল এক পুরনো মডেলের মোটর গাড়ী। রিক্সা এবং গাড়ীতে মাইক বসিয়ে যুগপৎ ঘোষণা চলল; এসে গেছে, এসে গেছে, আপনাদেরই চিরপরিচিত, চিরপ্রিয় দল কিন্নরী অপেরা। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বহুবার প্রথম স্থানাধিকারী 'দোল দিও না বধূ' নাটক নিয়ে। ওদিকে ঘোড়ার গাড়ী থেকে প্যামফ্লেট উড়ছে: অভিনব অভিনব। এবার আপনাদের হৃদয় জয় করতে, মন কেড়ে নিতে এসে গেছে সর্বজনপ্রিয় ভৈরব অপেরা বহু আলোচিত বহু প্রশংসিত পালা-নাটক 'একা কেন রজনী কাটাবে' নিয়ে। ভূমিকায়···ইত্যাদি।

দুদলেরই প্রচুর পোষ্টার পড়েছে গ্রামের সর্বত্র এবং দু দলই নিজের নিজের অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সামিয়ানার সামনে দুদলেরই ছোটখাট তাঁবু খাটিয়ে অফিস-ঘর। তাঁবুর সামনে মেলার ঢঙে মাইক নিয়ে কর্মকর্তারা বীরবিক্রমে কর্ণপটবিদারী চেচাচ্ছে। একজন প্রশ্ন করছেন: কী নাটক? আরেকজন উত্তর দিচ্ছেন: দোল দিও না বধূ। তারপরের প্রশ্ন: প্রধান ভূমিকায়? উত্তর: কে আবার? যাত্রাসম্রাট হীরককুমার। মাইকের নীচে দুটি ক'রে ছোকড়া টিকিট বিক্রি করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে।

আজ সেই শুভদিন। সকাল থেকেই সুরু হয়ে গেছে কর্মকর্তাদের ব্যস্ততা। নায়ক নায়িকা এবং মোটামুটি যাদের একটু বেশী কথা আছে তাদের নিয়ে

ব্যস্ততা। শরীরের জন্ত, গলার জন্ত, চেহারার জন্ত সম্ভাব্য সবরকমের আরাম —আয়েশের ব্যবস্থা।

আজ কিন্নরী অপেরার 'দোল দিও না বঁধু'। কাল ভৈরব অপেরার 'একা কেন রজনী কাটাবে?'

টিকিট বিক্রি চলছে পুরোদমে। সারা গ্রামের লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যাত্রা দেখার জন্ত।

কাউণ্টারের পাশে বসে ভৈরব ঘটক টাকা গুনছিল। গোনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল হঠাৎ কী ভেবে ভৈরব কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠল। সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, বেশ কিছুক্ষণ। তারপর নিবিষ্টমনে কী যেন দেখতে লাগল। ওর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে পাশে বসা কেষ্টো বোস তাকিয়ে দেখল দেয়ালের গায়ে টিকটিকিটা যে পোকাটাকে ধরতে চাইছে সেটা বারে বারে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ভৈরব এক দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল, কেষ্টা বোতলটা আন তো?

কেষ্টো বোস বোতল গ্লাস নিয়ে এসে বলল, এই অবেলায়?

অবেলায় কী রে, তিনটে তো বেজে গেছে? ভৈরব বোতল থেকে খানিকটা গলায় ঢেলে নিয়ে বলল, কাব্যে তো একেই অপরাহ্ণ বলে।

কেষ্টো বোস চমক খেল। ভৈরব ঘটকের ভাষায় কাব্য, অপরাহ্ণ! কী ব্যাপার?

ভৈরব ঘটক খুব কুইক সিপ করতে করতে এক গাল হেসে উঠল। গ্লাসে ঢালতে ঢালতে কেষ্টো বোসকে আরও কাছে ডেকে এনে বলল, আজ ওদের পালা। মনে আছে তো?

মনে আছে মানে, কেষ্টো বোস নিজের মনে বলল, সকাল থেকে চীৎকার চেঁচামেচি, মাইকের আওয়াজ, প্যাঁ পোঁ ধ্বনি—মনে না রেখে উপায় আছে। ঘাড় নেড়ে বলল, বিলক্ষণ।

ওদের পালা যেন তেন প্রকারেণ···এইটুকু বলে কী ভেবে থেমে গেল ভৈরব ঘটক। তারপর গেলাসের বাকী অংশটুকু ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলল, 'অরন্তীকুমারীকে ডেকে দাও।'

অরন্তীকুমারী ভৈরব অপেরার নায়িকা এবং অরন্তীকুমারীকে ডেকে পাঠাবার অধিকার এই সংস্থায় একমাত্র ভৈরব ঘটকেরই আছে। ভৈরব এই

সংস্থার একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলেই নয় জয়ন্তীকুমারীকে সে পাঁক থেকে তুলে এনে সমাজে মর্যাদা দিয়েছে।

জয়ন্তীকুমারী এল। তার নিজস্ব বৈকালিক প্রসাধন অর্দ্ধসমাপ্ত রেখেই উঠে এল। ভৈরব তাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে জয়ন্তী। বলেই দুটো গ্লাসে পাঁচ বছরের পুরনো দশরথের বড় পুত্রকে ঢেলে জল মেশাতে মেশাতে সুটকেশটা খুলে টাকাগুলো আবার গুনতে লাগল।

টাকা গোনাই ছিল। জয়ন্তীর সামনে বড় নোটগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। জয়ন্তী জিজ্ঞেস করলো, কী কাজ?

ভৈরব একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলল, গলাটা একটু ভিজিয়ে নাও।

জয়ন্তী বলল, কী করতে হবে বলুন।'

চোখের ওপর চোখ রেখে ভৈরব বলল, 'যে কাজটা করতে হবে···শোন তোমার বোনের বিয়েতে কত টাকার প্রয়োজন বলছিলে?

কী করতে হবে বলুন, জয়ন্তী বলল।

মেজাজটা ভাল নয় দেখছি, এটা খেয়ে নাও ভাল লাগবে।

বললুম তো. এখন খাব না। কী করতে হবে বলুন।

ভৈরব বুঝল এভাবে হবে না। নাটক দূরের কথা এক লাইন সাহিত্য জীবনে কোনদিন রচনা করে নি ভৈরব ঘটক কিন্তু একাধিক নাট্যকার পরিচালককে রীতিমত চরিয়ে বেড়াচ্ছে এবং এই সংস্থায় কিছু না হলেও প্রায় পঞ্চাশজন কর্মীর অন্ন জুটিয়ে চলেছে। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না বুঝে নিয়ে জয়ন্তীর প্রোজ্জ্বল নারীত্বের কাছে নিজেকে সঁপে দিল।

ভৈরব বলল, আমাকে ভালবাসার কথা বলছি না। কিন্তু নাটককে, নাট্য-সংস্থাকে তো নিশ্চয়ই বাস।

বাসি। জয়ন্তী ছোট্ট জবাব দিল।

বেশ। এটাও নিশ্চই চাও যে আমাদের প্রডাকসান ওদের চেয়ে ভাল হোক, ওদের চেয়ে বেশী প্রশংসা আমরা পাই, ওদের চেয়ে বেশী অর্থ আমরা রোজগার করি। টাকাটা যদিও এখানে কোন ফ্যাক্টর নয়, টাকা আমার যথেষ্ট আছে। তোমার বোনের বিয়ে—বলতে গেলে আমারই মেয়ের বিয়ে। দায়দায়িত্ব সবই আমার।

জয়ন্তী এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, বুঝলাম, কিন্তু কি করতে হবে, সেটাই বুঝলাম না।

বুঝবে বুঝবে। ভৈরব এবার খুব তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নীচে নেমে এসে একেবারে জয়ন্তীর পাশে বসে কানের কাছে মুখ নিয়ে ওর কর্তব্যকর্ম বুঝিয়ে দিল।

সব শুনে কিছুক্ষণ ভাবল জয়ন্তী। খুব নিবিষ্টমনেই ভাবল। তারপর ভৈরবের চোখের দিকে তাকাল একবার, তারপর স্যুটকেশটার দিকে। বাসন্তীর করুণ মুখখানা মনে পড়ল। মনে পড়ল কিন্নরী অপেরার দিব্যকান্তি, অনুপম হীরককুমারকে।

জয়ন্তীকুমারী রাজী হয়ে গেল।

ভৈরব ঘটক এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, গ্রাটস্ লাইক এ গুড বয়। বয়, পেগ নেয়াও।

খেয়াল নেই যে এটা বার নয়। কিংবা হয়ত পুরো খেয়াল আছে বেয়ারার এর, পুরো খেয়াল আছে কোথায় বসে আছে এখন।

কিন্তু বয়-এর ভূমিকায় একজন এল বোতল নিয়ে। ভৈরব বোতল দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, শুয়ারকা বাচ্চা, এটা নয়, ভ্যাট সিক্সটিনাইন নিয়ে আয়।

এল। ভৈরব সেটা হাতে নিয়ে নিজের সন্তানের মত আদর করতে লাগল। শেষ চুম্বনটা দিয়ে জয়ন্তীর হাতে সমর্পণ করে পিঠ চাপড়ে বলল, যাও যাও, মেক-আপ শেষ করে তাড়াতাড়ি চলে যাও, আর দেরী কোরনা। প্রয়োজন হলে সংকেত দিও, আরো পাঠাব—রয়েল স্যালুটও আছে।

জয়ন্তী তবুও দাঁড়িয়ে রইল দেখে ভৈরব চিন্তা করল অল্প একটু সময়। তারপরেই নিজের ভুল বুঝতে পারার ভান করে জয়ন্তীকে দেখিয়ে নিজের গালে ঠাস ঠাস চড় মারতে মারতে বলল, ওঃহো, আসলই ভুল হয়ে গেছে। ছিঃ ছিঃ। এই নাও, এতে আপাতত পাঁচ আছে। কাজ হাসিল হলে আরও। তারপর পিঠ থেকে হাতটা সরিয়ে এনে জয়ন্তীর চিবুক স্পর্শ করে ভৈরব বলল, যাও যাও ব্রাদার, আর দেরী কোরনা।

জয়ন্তীকুমারী উঠে পড়ল।

শো আরম্ভ হবার নির্দ্ধারিত সময় আটটা। প্রত্যেকটি চেয়ার ভর্তি হবে, একটা চেয়ার বসান হবে, বাইরে আসনের জন্য হাহাকার চলবে, সর্বোপরি সাহেব-সুবোরা সব আসবেন। মহকুমা শাসকরা আসছেন। সুতরাং যতক্ষণ না আসেন নাটক তো আর সুরু করা যায়না।

তবে কিছু কিছু লোকজন আসতে সুরু করেছে। হিরো হীরককুমারকে

কিংবা হিরোইন মিস্ আইভিকে যদি কোন ফাঁকে কোথাও একটু দেখা যায় কিন্নরী অপেরার অধিকারী গৌরীকিং করবাবুকে ঘিরে চামচেদের ছোটখাট এক জটলা। গৌরীবাবু সব দিক তদারকি করে চলেছেন নিপুণ হাতে। যার হাতে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সব মনে করিয়ে দিচ্ছেন। পালা শুরু হতে বাকী মাত্র আর ঘণ্টাখানেক, তার এখন নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই।

মাঝে মাঝে হলো পাঠিয়ে খবর নিচ্ছেন, হিরো কী করছে, হিরোইন কী করছে এবং অন্যান্য ছোটখাট শিল্পীরাও।

জয়ন্তীর নিজের হাতে তুলে দেওয়া গ্লাস, হীরক সিগারেটে ঘন ঘন টান দিতে দিতে ভাবছে আজ সে কার মুখ দেখে উঠেছে। কোলকাতার শ্রেষ্ঠ দলের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সংগে বসে খাওয়া—একী কম ভাগ্যের কথা! খুব রসিয়ে রসিয়ে জয়ন্তীকুমারীর রূপসুধা পান করতে করতে হীরককুমার সিপ করতে লাগল। আঁচল পড়ে যাওয়া জয়ন্তীর বুকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে কার সংগে যেন তুলনা করে হীরককুমার। খলখলিয়ে হেসে উঠল জয়ন্তী। রক্তে আগুন ধরান হাসি।

ছোট মেয়ের মত সুরু করল জয়ন্তীকুমারী। হীরককুমারের খুব ভাল লাগল। ড্যাট যা করতে পারছিল না তাই করল জয়ন্তীর ছেলেমানুষী। জয়ন্তীর চোখে চোখ রেখে হীরক বিমূঢ় হল। এত বিদ্যুৎ, এত আলো থাকে একটি মেয়ের চোখে? মদ আর সেক্স-এর পাকে হীরককুমারের মাথায় ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্মরণ সুরু হল। ভুলে গেল ওর নাম হীরককুমার, কিন্নরী অপেরার যাত্রানুর্ব। যার নামেই প্রেক্ষাগৃহ নিমেষে পূর্ণ হয়ে, আসনের জন্য পড়ে হাহাকার।

সব শুনে ভৈরব খুব ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে বলল, ফুরিয়ে আসছে বলছিস। শোন, আরেকটা বোতল তুই রেডি করে রাখ্। সংকেত পেলেই চালান দিবি। শোন্ আমার জন্য একটা নিয়ে আয়।

ড্যাট? ছোকরাটি জিজ্ঞেস করলো।

না বাবা, ওসব আমার চলে না। আমার জন্য দু নম্বর একস্ট্রা। আমি গরীব অধিকারী, ওসব কী আমাদের চলে রে। যেমন ঠাকুর তেমন নৈবিদ্যি।

ছোকরাটি নাচতে নাচতে চলে গেল।

যাত্রার কনসার্ট সুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সামিয়ানার ভেতর দর্শকও প্রায় পরিপূর্ণ। মাইকে অবিরত ঘোষণা চলছে : আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরু হচ্ছে আজকের পালা—দোল দিও না বধু। শ্রেষ্ঠাংশে যাত্রাসূর্য হীরককুমার ও নাইটিঙ্গেল-কণ্ঠী মিস আইভি। বিশেষ বিশেষ অংশ টেপ করে রাখা হয়েছে এবং এখন সেগুলো শোনানো হচ্ছে।

: এই বজ্রমুষ্টির নিষ্পেষণ থেকে পলায়নের চেষ্টা কোরনা সুন্দরী, বৃথা বৃথা।

: তোমার আস্ফালনে আমি ভীত নই শয়তান।

: এত বড় আস্পর্দ্ধা ? জান, তোমাকে আমি এই মুহূর্তে পতঙ্গের মত পিষে মেরে ফেলতে পারি।

: তুমি নিষ্ঠুর, তুমি নির্মম, তুমি দস্যু।

: হা হা হা। জেনে রেখ সুন্দরী সূর্য সমুদিতে পদ্মং বিকাশতে। হা হা হঠাৎ টেপ বন্ধ করে দিয়ে মাইকে আবার ঘোষণা : আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরু হচ্ছে আজকের পালা—দোল দিওনা বধু।

সামিয়ানার বাইরেও প্রচুর লোক অপেক্ষমান। পুলিশের ভ্যান, কিছু ইউনিফর্ম পরিহিত পুলিশ, কিয়রী অপেরার স্বেচ্ছাসেবক সব প্রস্তুত। একে একে সব ভি আই পি দর্শকরাও আসতে সুরু করেছে।

গৌরীকিংকর এখন ব্যস্ততার একেবারে তুঙ্গে। এক স্বেচ্ছাসেবককে খুব মনোযোগ সহকারে কি যেন বোঝাচ্ছিল এমন সময় এক কর্মকর্তা এসে খবর দিল, সাংঘাতিক নিউজ স্যার। হীরককুমারের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। এত মাল খেয়েছে যে দাঁড়াতে পারছে না। উপরন্তু 'দোল দিও না বধু' পালার ডায়ালগ ভুলে কী সব আবোল তাবোল বকছে। সেগুলো নাকি 'একা কেন রজনী কাটাবে'র ডায়ালগ।'

কথা শুনে স্তম্ভিত হবার আগেই আবার কে যেন এসে খবর দিল এস ডিও সাহেব এসে গেছেন।

হীরককুমারকে নিয়ে বিচলিত হবার মত তেমন কিছু পেল না গৌরীকিঙ্কর কারণ ও জানে যতই পেটে পরুক হীরককুমারকে একবার ষ্টেজে উঠিয়ে দিতে পারলে হীরককুমার তখন যাত্রাসূর্য হীরককুমার। সংলাপের প্রথম দিকটা ধরিয়ে দিলেই হল তারপর একেবারে বাঁয়ারের বোতল খোলার মত। প্রম্পটার মন্থবাবু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন।

সুতরাং গৌরীকিঙ্কর নিশ্চিন্ত মনে এসডিও সাহেবকে স্বাগত জানাতে গেল।

ক্রমে ক্রমে বিডিও এলেন, অন্যান্য ডিআইপিরা এলেন। এলেন ডি. এম। কিন্তু পালা সুরু হল না। এদিকে সময় বয়ে চলল, রাতও হয়ে এল।

গৌরীকিঙ্করকে এরপর সত্যি বিচলিত দেখাল। চ্যালা-চামুণ্ডাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে হীরককুমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইল। ওর চোখ খোলাতে পারছে না কেউ। গৌরী নিজে হাত লাগাল। প্রথমে ভালভাবে, ভদ্রভাবে, বাবা বাছা করে মিষ্টি কথায়, মিষ্টি গলায়। ক্রমশ গলার স্বর এবং ভাষা দুটোই এমন সপ্তমে চড়ল যে অধস্তনরা কানে আঙুল দিয়ে সরে পড়ল।

এদিকে ঘড়িতে তখন দশটা অতিক্রান্ত হয়েছে। ভেতরে উদগ্রীব জনতার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। নিতান্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং অন্যান্যদের ভয়ে বিশেষ কিছুই করতে পারছে না। তবুও তারই মধ্যে চাপা ক্রোধ উথলে উথলে উঠছে। মাইকে ঘন ঘন ঘোষণা চলল : আমাদের নায়ক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুণ পালা সুরু করতে দেরী হচ্ছে বলে আন্তরিক দুঃখিত ; নিজ গুণে ক্ষমা করে আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরে বসুন।

গৌরীকিঙ্করের সব অহংকার সব গর্ব ধূলিসাৎ করে দিল হীরককুমার। এটা গৌরীকিঙ্করের জীবনে যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনই আকস্মিক। জীবদ্দশায় কোনদিন কল্পনা করতে পারেনি যে হীরক ওকে এমন ভাবে ডোবাবে। অথচ কী অবস্থা থেকে উঠিয়ে এনেছে ওকে। শুধু উঠিয়ে আনা নয়, একের পর এক পালায়, রূপ করা সত্ত্বেও, চান্স দিয়ে দিয়ে ঘষে মেজে আজকের হীরককে পারফেক্ট করে তুলেছে। আজ হীরককুমার যে কোন রোলে ক্যারেক্টার আর্টিষ্ট।

গৌরীকিঙ্কর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল হীরকের অবস্থা। কী বিশ্রী ভঙ্গীমায় শুয়ে আছে। ডান পা-টা বেতের টেবিলটার ওপর, বাঁ পা-টা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, হাত দুটো ও মাথাটা ঝুলে পড়েছে বেতের চেয়ারের এদিক ওদিক—অনেকটা মরা ব্যাং যে ভাবে থাকে। যে পা-টা গড়াগড়ি যাচ্ছে তার সামনে স্থির হয়ে শুয়ে আছে দুটো গ্লাস, একটা থ্রি-ইন্স ও একটা ভ্যাট-সিক্সটিনাইনের বোতল। গৌরী নীচু হয়ে ভ্যাট-এর বোতলটা তুলে নিয়ে নামটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়ল। বিমূঢ় বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন উত্তরই খুঁজে পেল না। বোতলটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, এটা কোত্থেকে এল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হুঙ্কার ছাড়ল, বনমালী, হুকুম সিং —কোই হায়?

বনমালী ছুটতে ছুটতে এল। তাকে কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, স্যার, আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাকছেন।

গৌরীকিঙ্কর হাতের বোতলটা হীরককুমারের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুধু বললেন, জরুরী কাজ আছে। আমাকে যেতে হচ্ছে।

তারপর বিদায় নিলেন বিডিও। তারপর থানার বড়বাবু জিপে-উঠতেই গৌরীকিঙ্কর তার কাছে একেবারে নুইয়ে পড়ল, স্যার আমাকে বাঁচান।

বড়বাবু জীপে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের অলটারনেটিভ হীরো নেই?

নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু পাবলিক শুনছে না।

ওদের ডিমাণ্ড হীরককুমারকেই চাই।

তবে আর কী. ষ্টেজে উঠে ক্ষমা-টমা চেয়ে টিকিটের টাকা ফেরৎ দিয়ে দিন।

এমন সময় একটা বড় ঢিল এসে পড়ল জীপের ওপর। বড়বাবু লাঠিটা নিয়ে জীপ থেকে নেমে এল।

থানার বড়বাবুর পেছন পেছন গৌরী এসে দাঁড়াল গ্রীনরুমে। দুজন সিপাইকে মঞ্চের পেছনে পোসটিং করে দিয়ে বড়বাবু নিজেই ডেকে নিয়ে এলেন এসডিও বরুণবাবুকে। সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে অনুরোধ করলেন, স্যার মাইকে আপনি ঘোষণা করে দিন যে টাকা প্রত্যেকে ফেরৎ পাবে এবং হীরকবাবুকে দিয়ে অভিনয় হবে পরশুদিন, ভৈরব অপেরার পরেরদিন। লোকে টাকা ফেরৎ না নিয়ে সেদিনও দেখতে পারে।

জয়ন্তীরাণীর মুখের দিকে চেয়ে ওই নিশুতি রাতে ভৈরব ঘটক প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল হঠাৎ। ওর হাসির গমক বাড়তে বাড়তে অট্টহাসিতে পরিণত হল।

জয়ন্তীর মুখে কোথাও সাফল্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই, বরঞ্চ গম্ভীর। সর্পিনীর মত ফণা তুলে প্রশ্ন করল, 'আপনি মদ খান অথচ সিগারেট খান না। কেন?'

ভৈরব বলল, যা একখানা হাসি দিলাম তোমাদের ওই যাত্রাসুর্য্য হীরক-কুমার পারবে?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।'

এবার একটা অন্য নাটকীয় হাসি হাসল ভৈরব। হাসতে হাসতে বলল, 'সুন্দরী, তুমি কী জান কিছু লোক আছে মদ খায় না, সিগারেট খায় না অথচ মেয়েমানুষের বাড়ী যায়?'

উদ্ধত ফণা না নামিয়েই জয়ন্তী বলল, 'রাত হয়েছে শুতে যাই।' বলেই তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে পায়ে লেগে পড়ে গেল বাংলা মদের বোতলটা। ভৈরবের চোখের সামনে গড়িয়ে পড়ল বাকী অংশটা। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে জয়ন্তীকুমারী নিষ্ক্রান্ত হল।

ভৈরব কিন্তু শুতে গেল না। কিন্নরী অপেরার পরিণাত রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে লাগল সারাটা রাত।

সকাল হতেই ভৈরব অপেরার ছেলেরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আজ 'একা কেন রজনী কাটাবে?' ভৈরবের লোকজন অতি মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠল কালকের কিন্নরী অপেরার কথা মনে রেখে। সর্বশেষ দৃষ্টিপাত রইল হিরো কিংশুক কুমারের ও নায়িকা জয়ন্তীরাণীর ওপর। পুলিশেও আগাম খবর দিয়ে রাখল এবং সর্বত্র পাহারার ব্যবস্থা হল।

কিন্নরী অপেরার লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সমবেদনার বাণী এবং নিজের দলের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে উৎসাহের কোরবাণী ছড়াতে ছড়াতে ভৈরব ঘটক সারা মুখে সাফল্যের টয়লেট মেখে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে সমগ্র স্কুল বাড়ী, প্রাঙ্গন, অনুষ্ঠান মঞ্চ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। পথের কাঁটা নিজের হাতে উপরে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম হতে বাধা কোথায়। সবগুলো প্রাইজও নিজের পকেটে আসছে—ঘটনাটা এত ছোট নয়। বড়—অনেক বড়। কারণ পৃথিবীটা অনেক বড়। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রট থেকে বিডিও এবং স্থানীয় গণ্যমান্যদের সার্টিফিকেট। এছাড়া আছে শুভউইল। সর্বোপরি টাকা —শুধু টাকা।

জয়ন্তীকুমারীকে দেখতে ইচ্ছে করল ভৈরবের এবং ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে মেয়েদের ঘর অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হল জয়ন্তীর নিজস্ব ঘরের সামনে। নাটকীয় ভঙ্গীতে ছড়ির সাহায্যে দরজায় টক টক করে দুবার মৃদু আওয়াজ তুলল। তাতে কোন কাজ হল না দেখে একটু জোরে এবং তারপর চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল : জয়ন্তী জয়ন্তী।

'একা কেন রজনী কাটাবে?' পালা-নাটকের মলাট, প্রধান চরিত্র এবং নায়িকা জয়ন্তীকুমারী তখন একা এবং বিনিদ্র রজনী যাপন করে অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। 'শুতে যাই' বলে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ মনে গতরাত্রে চলে এসেছিল কিন্তু ঘুমুতে পারেনি মুহূর্তমাত্র। সারারাত ভীষণ এক যন্ত্রণায় পীড়িত

হয়েছে। বেদনায় আহত হয়েছে শুধু। কিসের যন্ত্রণা, কিসের বেদনা, তখন বোঝেনি। সকালের দিকে একটু তন্দ্রামত এসে গিয়েছিল। এখন ভৈরব ঘটকের ডাকে হঠাৎ সব প্রশ্নের উত্তর, সব বেদনার কারণ উপলব্ধি করল। অবিন্যস্ত পোষাক ঠিকঠাক করে দরজা খুলে দাঁড়াল।

ভৈরব বলল, 'সুপ্রভাত। কাল ভাল ঘুম হয়েছিল তো জয়ন্তী?'

জয়ন্তীকুমারী ভৈরবের গায়ে বাসী মদের গন্ধ পেল। বলল, 'কিছু বলবেন?'

'না তোমাকে দেখতে এলুম, তোমার খবর নিতে এলুম।'

'দেখলেন তো!'

'ও বাবা, তোমায় দেখছি এখনও রাগ পড়েনি। এতবড় একটা সাফল্য। আজ বড় আনন্দের দিন, জয়ন্তী।'

'কার?'

'কেন, তোমার, আমার, আমাদের সকলের।'

'হুঁ তাই বটে!' জয়ন্তী গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি হচ্ছি আপনার কাছে কাগজের ফুল।'

'ঠাট্টার অর্থটা বুঝিয়ে বলবে?'

আষাঢ়ের আভাষ টলমল করে উঠল জয়ন্তীর দুচোখের কোণে। সামলে নিয়ে বলল, 'যাক সে কথা। আমার একটা উপকার করবেন?'

'নিশ্চয়ই। কী করতে হবে বলো।

জয়ন্তী কিছু বলতে গিয়ে বলল না, চুপ করে রইল। ভৈরব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কই বলো কী করতে হবে?'

প্রভাতের দীপ্তি জয়ন্তীর ম্লান মুখে সায়াহ্নের গোধূলিতে রূপান্তরিত হল। বিষণ্ণ গলায় বলল, 'আজ তো আমাদের নাটক। সুতরাং আমি এখন ঘুমুতে চাই।'

'তা আমায় কী করতে হবে? চলে যেতে বলছ?'

'না' তা কী বলতে পারি আপনাকে। আপনি হলেন মনিব, আমরা মাইনে করা গোলাম। আমার অনুরোধ আমায় যেন এ সময় কেউ ডিসটার্ব না করে।' তারপর কৃত্রিম হেসে বলল, 'অভিনয়ের শুনে আপনার মান তো রাখতে হবে।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।' উত্তর শুনে খুব খুশী হল ভৈরব ঘটক। যাবার

আগে বলল,'আমি অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি কেউ যেন এখন তোমার ঘরে না আসে, তুমি পেট ভরে ঘুমিয়ে নাও।'

ভৈরব ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যেতেই জয়ন্তীকুমারী এসে বসল হাজি চেয়ারে। সমস্যা অর্জিত চিন্তাসূত্রগুলি মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। আকুপাংচার করছে অহরহ শুধু একটি কথা : এ আমি কী করলাম? সমস্ত শরীরের মধ্যে বিষের জ্বালা। বিষ খেয়েছে সে নিজেই, এখন শুধু তিলে তিলে মৃত্যুর অপেক্ষা। যাতনায় ছটফট সুরু করল জয়ন্তী। মনের মধ্যে শুধু একই জিজ্ঞাসা : এ আমি কী করলাম, এ আমি কী করলাম। ছিঃ ছিঃ।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল জয়ন্তী। অপকর্মের চিত্রগুলি সার্থক এডিট করা চলচ্চিত্রের মত একের পর এক মনের পর্দায় ভেসে উঠল। গ্লাসে ভ্যাট সিক্সটিনাইন ঢালা বেশ খানিকটা, তার সঙ্গে অল্প জল মেশানো তারপর গোপনে ট্যাবলেট, হীরককুমারের হাতে তুলে দেওয়া। হীরককুমারের কোলে মাথা রেখে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা, হাসিতে তুফান তোলা, নিখুঁত প্রেমের অভিনয়ে সব মিলিয়ে হীরককুমারের নীলাঞ্জন ছায়ায় নিজেকে সঁপে দেওয়া।

অথচ অভিনয় জয়ন্তীরও পেশা। অভিনয়ই জীবন। অভিনয়েই অস্তিত্ব। জয়ন্তী সেই জীবনে বিষ মিশিয়েছে। এখন তার পরিণতির জ্বালায় যন্ত্রণা পেতেই হবে। দুহাতে নিজের চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগল জয়ন্তী। নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠল নিজেরই ওপর। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। শাস্তিই তার একমাত্র শাস্তি। অনুতাপে দগ্ধ হিংস্র হয়ে উঠল জয়ন্তী। নিজের কৃতকর্মের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। টেবিলের ওপর রাখা গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝনঝনিয়ে ভেঙে পড়ল সেটা দেয়ালের গায়ে।

আওয়াজ শুনে ছুটে চলে এল প্রিয়সখী প্রিয়ংবদা, কী হয়েছে দিদি?

ক্ষিপ্ত সর্পিনীর মত ফণা তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জয়ন্তী, তুই যা এখান থেকে, কী চাস্? যা যা।

প্রিয়ংবদা অবাক হয়ে বলল, 'কী যেন ভাঙার আওয়াজ পেলাম।'

জয়ন্তী ফোঁস করতে করতেই বলল, আমার মাথা ভেঙেছি। তোর মুণ্ডু ভাঙব। যা ভাগ।

প্রিয়ংবদা কিন্তু গেল না। দিদির দিকে চেয়ে রইল এক দৃষ্টিতে। মেয়েটি

বয়সে অনেক ছোট এবং মুখখানি খুবই ঢলঢলে। অপূর্ব সুন্দর লাবণ্যে সারা দেহ ভরা দীঘির মত টলটল। সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জয়ন্তী কেমন যেন হয়ে গেল। কী যেন খেলে গেল ওর মাথার মধ্যে। ফণা নামিয়ে স্বরূপ প্রকাশ করে বলল, 'বোস। একটা কাজ করতে পারবি?'

সখী তবু না বসে দাঁড়িয়ে রইল দিদির সামনে। জয়ন্তী নরম গলায় বলল, 'ওই সুটকেশটা খুলে ট্যাবলেটের বাক্সটা দে, আর এক গ্লাস জল।'

প্রিয়ংবদা বাক্সটা এগিয়ে দিয়ে গ্লাস খুঁজতেই জয়ন্তী মিষ্টি হেসে বলল, 'গ্লাসটা ভেঙে ফেলেছি রে। আরেকটা গ্লাস নিয়ে আয়।'

জল দিয়ে প্রিয়ংবদা শুধোল, 'কী বড়ি খাচ্ছ দিদি?'

প্রশ্ন শুনে জোরে হেসে উঠল জয়ন্তী। প্রিয়সখীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'না রে, যা ভাবছিস তা নয়। এই স্যাব, এনাসিন। ভীষণ মাথা ধরেছে রে।' তারপর একটু থেমে বলল, যে ভূত মাথায় ঢুকেছিল, তার তুলনায় অন্য কোন বিষ বিষই নয় রে।

প্রিয়ংবদা বুঝল কী বুঝল না বোঝা গেল না। জয়ন্তীর আঙুল স্পর্শ করে বলল, 'মাথা টিপে দিই দিদি?'

'নারে। তার চেয়ে তুই বরঞ্চ একটা কাজ কর। ভীষণ জরুরী কাজ। এই কাজটা তুই ছাড়া আর কারও সাধ্যি নেই।'

বলেই কাগজ কলম নিয়ে জয়ন্তী খুব অল্প সময়ে একটা চিঠি লিখে সখীর হাতে দিয়ে বলল, এটা হীরকবাবুর হাতে দিবি। খুব গোপনে, খু-উ-ব সাবধানে কেউ যেন ··বুঝলি তো?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল প্রিয়ংবদা। চিঠিটা ব্লাউজে ঢুকিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

যতই বেলা হতে লাগল ততই বাড়তে লাগল ভৈরব অপেরার আয়োজন। আজও ভি. এম. আসবেন। আসবেন এস. পি., ডি. এস. পি। এস. ডিও, বিডিও, ও সি—এরা তো আছেনই। কাল গণ্ডগোল হয়েছে সুতরাং আজ সবাই সজাগ, সন্ত্রস্ত। ভৈরব অপেরার হিরো কিংশুককুমারের ঘরে লোক মোতায়েন করা হয়েছে। জয়ন্তীকুমারীর ব্যবস্থা তো ভৈরব ঘটক নিজেই করেছে। সব মদের বোতল ভৈরবের জিম্মায়। নিজেও এক ফোঁটা স্পর্শ করছে না। খাওয়া দাওয়া হবে শালা শেষে, রাত্তিরে। তখন যত খুশী খাও,

যত খুশী স্ফূর্তি কর।

ঘোড়ার গাড়ীটা অফিস ঘরের সামনে এনে সেখানে আরেকটা মাইক বসানো হয়েছে। দু জায়গা থেকেই চলছে অবিরত ঘোষণা : অন্ত শেষ রজনী। নাটক—একা কেন রজনী কাটাবে? শ্রেষ্ঠাংশে কোলকাতার প্রথিতযশা অভিনেত্রী জয়ন্তীকুমারী এবং কিংশুককুমার। তারপরেই বিশেষ অংশ বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে।

দর্শকরা যখন কিছু কিছু আসতে সুরু করেছে এবং যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, তখনই হঠাৎ খবর পাওয়া গেল জয়ন্তীকুমারীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না নিজের ঘরে, না অন্য কারো ঘরে। ভৈরবের দলবল এবং ভৈরব স্বয়ং সর্বত্র খুঁজতে লাগল। কী আশ্চর্য, ওর ঘরের সামনে পাহারা, স্কুলের গেটে পাহারা, পায়খানার বাইরে পাহারা। তথাপি মেয়েটা গেল কোথায়। ভৈরব পাগলের মত তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগল।

জয়ন্তীকুমারী তখন ট্যাক্সির ভেতর এবং ট্যাক্সি বেগে ছুটে চলেছে। পাশে বসে হীরককুমার।

হীরককুমার অনেকক্ষণ পর বলল, কিন্তু এটা কী ভাল করলে জয়ন্তী?

জয়ন্তী বলল, 'তা জানি না হীরক। তবে কিছু একটা না করতে পারলে শান্তি পাচ্ছিলুম না। কেবলই মনে হচ্ছিল যে অপরাধ করেছি তার অনুশোচনার পথ বোধহয় একটাই।...আমি ভুল করিনি।

'কিন্তু তুমিও তো অভিনেত্রী। অভিনয় তো তোমারও পেশা।'

'সেইজন্যেই তো।'

বিমল কর ঃ দুটি গল্পের দর্পণে

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী

যথার্থই জিজ্ঞাসু বিবেকী শিল্পী যিনি, শিল্পের মায়াবী ভেলায় চড়ে জীবন নামক সমুদ্রের পারাপারহীন রহস্যের অন্বেষণে যিনি যাত্রা করেন, তাঁর জীবনে কোন অচল স্থির বন্দরের নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেই। অভিজ্ঞতার বিচিত্ররূপের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাঁকে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের নানান্ রূপান্তরের মুখোমুখি হতেই হয় বারবার। আর এর ফলেই তাঁর রচনায় 'কন্টেন্ট' ও 'ফর্মে'র কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে ক্রমাগত। আসলে এই বিষয় ও রীতি-পরিবর্তনের প্রচ্ছদের আড়ালে অনেক সময়েই নিহিত থাকে লেখকের জীবন বিষয়ক বক্তব্য বা দৃষ্টির কিছুটা রূপান্তর। বলাবাহুল্য তা সবসময়ে বড়রকমের মৌলিক পরিবর্তন না-ও হতে পারে। কিন্তু তবু কৌতূহলী পাঠকের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হবার সঙ্গত কারণ আছে।

পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের দশকের সেই 'ছোটো গল্প নতুন রীতি'—আন্দোলনের পুরোধা শিল্পী বিমল কর-এর অল্প কিছুকাল আগে প্রকাশিত দু'টি গল্প প্রসঙ্গে এইসব ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, গল্প দুটি হ'ল 'সুখ' [প্রথম প্রকাশ—দেশ, ১৫ই কার্তিক, ১৩৮২] ও 'আয়োজন' [প্রথম প্রকাশ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮২]

বিমল কর গল্প লিখছেন আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর হ'ল! এর মধ্যে গোড়াকার দশ-বারো বছর তিনি যে সব গল্প লিখেছেন তাদের বেশির ভাগই সমকালীন জীবনের বাইরেকার অভিজ্ঞতা—চোখে দেখা নানান্ ঘটনা ও চরিত্রের ওপর নির্ভর করে লেখা। এর অর্থ, তখনও পর্যন্ত তিনি সমকালীন ছোট গল্পের প্রবাহ অনুসরণ করেই চলেছিলেন।

কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ ও ষাটের গোড়াকার বিমল কর, যেন মনে হল এক আমূল রূপান্তরিত সত্তা। বাইরের জগতের চেয়ে অন্তরের অনাবিষ্কৃত অন্ধকার বিশাল পৃথিবীর রহস্য-উন্মোচনে তিনি যেন তদ্‌গতচিত্ত। মৃত্যু-চেতনার যন্ত্রণাবিদ্ধ কিংবা অমোঘ বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার অনুভবে বিষণ্ণ অসহায় মানুষের মগ্নচেতনার ছবি আশ্চর্য রেখায় ফুটে উঠতে লাগল তাঁর এই

পর্বের লেখায়। 'সুধাময়,' 'অপেক্ষা,' 'শূন্য' ইত্যাদি এদের মধ্যে প্রতিভূ-স্থানীয় কয়েকটি গল্প। এইসব গল্পে লেখক নিঃসঙ্গ অন্তর্মুখী ও রোম্যান্টিক বিষাদে মগ্ন স্বীয়সত্তার রূপক ছবিকেই যেন তুলে ধরলেন নিপুণ শিল্পীত আধারে। এই পর্বের আশ্চর্য সব গল্পে সন্ধান দিলেন নরনারীর অন্তর্লোকের অনেক অন্ধকার জটিল পথের। সহনচারী চেতনার আলো ফেলে ফেলে দেখালেন সময়সময়ের ভাঙাচোরা মানুষের মনের নানান্ প্রচ্ছন্ন মূর্তি,—রুদ্ধকামনার আর্তিতে, বিচ্ছিন্নতায় যন্ত্রণায় কিংবা নিয়তির প্রহারে যা বিপর্যস্ত। আর এই সব মূর্তি রচনার নিভৃত প্রকোষ্ঠে সেদিন লেখকের স্বীকারোক্তিপ্রবণ আত্ম-আবিষ্কারধর্মী আপন সত্তা বারেবারেই দেখা দিয়েছিল, সন্দেহ নেই।

কিন্তু দিন বদল হ'ল। এলো সত্তরের দশক। ইদানীং কিছুকাল থেকে চোখে পড়ছে ষাটের দশকের সেই গল্পকার যেন নিজেকে অতিক্রম করতে চাইছেন। বাস্তব জীবন-ভাবনায় সজীব সচল সব লেখকের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্বে-ই এই পালাবদলের ইঙ্গিত থাকে। তাঁরা অনেক সময়ে নিজের অগোচরেই বিবর্তিত রূপান্তরিত হ'ন। এই রূপান্তর কেবল শিল্পের রীতি বদলই নয়, জীবন সম্পর্কিত প্রেক্ষণভঙ্গির-ও পরিবর্তন। বিমল কর মহাশয়ের ইদানীংকালের অন্তত কোন কোন গল্পে এধরণের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে যেন। আগেকার তুলনায় কিছুটা বেশি 'অবজেকটিভ' মনে হচ্ছে তাঁকে। সহজ বাস্তবের আলো হাওয়া যেন আরো অনেকটা ছড়িয়ে পড়ছে তাঁর একালের গল্পে। আসলে ঠিক এ-ও নয়। আসলে তাঁর জীবনকে দেখার যে চোখ তা এতদিন অনেক খানিই ছিল যেন রোম্যান্টিক বিষাদে ভরা। সেই রোমান্টিক বিষণ্ণ দৃষ্টির আলোয় তিনি নরনারীর অন্তর্লোকের অনেক দূরপথ স্বচ্ছ করে তুলেছেন ঠিকই, কিন্তু চারপাশের চেনামানুষের সহজ অথচ নিতান্ত বাস্তব সম্পর্কের অনেকদিক তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক একটি। মায়াবিশ্বের কথা সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত মানবিক সম্পর্কের এই একাধারে একান্ত সহজ ও গহন জটিল রূপটি গল্পকার বিমল করের দৃষ্টি তেমনভাবে হয়ত এতদিন আকর্ষণ করেনি। ষাটের দশকের গল্পে তাঁর যেন অন্যকিছু বিশেষ অভিষ্ট ছিল। 'মায়াবী বিষাদে'র মতো সেই লক্ষ্যবোধের সাধনায় তিনি ছিলেন অতন্দ্র। ইতোমধ্যে জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-মননের ক্রমান্বয় প্রসার ও গভীরতা তাঁকে আরো জীবন-ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। আর সেই রূপরিণত নির্মোহ বাস্তব দৃষ্টি নিয়েই তিনি দাম্পত্য সম্পর্ককে তাঁর ইদানীংকালে রচিত আলোচ্য দুটি গল্পের

উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু বিমল কর বাইরের জগতের একান্ত বাস্তব উপকরণ নিয়ে যতই গল্প লিখুন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে বিবর্তনের আভাস যতই লক্ষিত হ'ক, একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে, আপন নিষ্ক্রিচেতনার মৌল গভীর স্তর থেকে তিনি কখনই সরে যাননি। আর এর ফলে তাঁর দাম্পত্যজীবনাশ্রিত এই দুটি গল্পের কোনটিই নিছক জীবনের স্থূলচেতনার কাহিনী হতে পারেনি। বিমল করের মৌল দৃষ্টি, তাঁর সত্তার নিজস্ব প্রবণতা গল্প দুটির বুনোটের ফাঁকে ফাঁকে অপরূপ ভঙ্গিতে মিশে গেছে।

'সুখ' ও 'আয়োজন'—দুটোই দাম্পত্যজীবনের গল্প। প্রথমটি দাম্পত্য-জীবনের একেবারে প্রথমপর্বের অর্থাৎ প্রায় সদ্যোবিবাহিত দম্পতির কাহিনী, পরেরটি যৌবনের প্রান্তসীমা ছুঁয়েছে এমন এক জোড়া নরনারীর গল্প। একালের দেশী বিদেশী নানা গল্পে-উপন্যাসে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও ব্যক্তি হিসাবে দুজনের মধ্যেকার ভুল বোঝাবুঝি বা 'ম্যাল-অ্যাডজাষ্টমেণ্টে'র পরিপ্রেক্ষিতে দাম্পত্য-সম্পর্কের ভাঙাচোরা রূপের ছবি আমরা অনেক দেখেছি। আলোচ্য গল্প দুটিতে বিমল করের দৃষ্টিকোণ কিন্তু এ থেকে স্বতন্ত্র। অসুখী দাম্পত্য জীবনের যে দুর্মোচ্য জটিল বিন্যাস বর্তমানকালের সাহিত্যে চোখে পড়ে, বিমল করের এই দুটি গল্পে তার প্রতিফলন ঘটেনি। তাঁর গল্পের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। সেই পারস্পরিক আকর্ষণের অম্লমধুর রসনিবিড় ছবি দিয়েই গল্প দুটির সজীব বাস্তব বাতাবরণ গড়ে তোলা হয়েছে। গল্প দুটির বড় অংশ জুড়ে (একেবারে 'আয়োজন' গল্পের একেবারে শেষটুকু বাদে প্রায় সবটাই) আছে স্বামী-স্ত্রীর প্রগাঢ় অন্তরঙ্গ মুহূর্তের বর্ণিল ছবি। সে ছবিতে দেহ কামনার উদ্দামরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দাম্পত্য সম্পর্ককে ঘিরে তীব্র দেহাসক্তির যে উদ্দাম ঝড় উঠেছে, তার মদির রূপের ছবি আঁকতে গিয়ে এই শক্তিমান গল্পকারের হাত এতটুকু কাঁপেনি। অথচ কখনোই তিনি অসংযত হননি, শিল্পের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুযোগ তিনি এতটুকু নেননি। 'আয়োজন' গল্পে তাঁকে একটু বেশি দুঃসাহসী মনে হবে। মনে হবে রীতিমতো বিপজ্জনক এলাকায় তিনি প্রবেশ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় স্বামী-স্ত্রীর অন্তরঙ্গ জীবনের পরিচয় দানপ্রসঙ্গে কাম-জড়িত স্বামীর আচরণের যে বিস্তৃত ছবি তিনি এঁকেছেন, তাকে কখনোই পাঠকচিত্তে অকারণ উত্তেজনা সঞ্চারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা চলে না।

'সুখ' সম্পর্কেও সেই কথা। সেখানেও শহরের এক তরুণ দম্পতির নির্জন পাহাড়ী ডাকবাংলোয় গিয়ে 'মধুচন্দ্রিমা' যাপনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি দেহ-কামনার জলে উঠেছে তীব্র রক্তিম শিখায়। সেই সব নিভৃত কামবিহ্বল মুহূর্তের কিছু বাস্তব ছবি অসংকোচে এঁকেছেন লেখক। কিন্তু এগল্পেও সেই ছবি কোথাও শিল্পের সীমা লঙ্ঘন করেনি। সে ছবিতে তুলির একটি টানও অকারণে দেননি কথাশিল্পী। এর মূল কারণ একটা-ই। দুটি গল্পেই এই কাম বা দেহাসক্তি বিষয়ের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। বস্তুত দুটো গল্পে এটাই লেখকের জীবন বিষয়ক বক্তব্যের প্রাথমিক ভিত্তি ভূমি। এর উপর ভর দিয়েই গল্পদুটির শিখরে পৌঁছুতে হয়। কিংবা বলতে পারি, কাহিনীর এই রঙিন প্রচ্ছদকে স্পর্শ না করে কখনই তার অভ্যন্তরের নিহিত গভীর চেতনাকে অনুভব করা যাবে না।

বলাবাহুল্য, দুটি গল্পেই লেখকের আঁকা দুই দম্পতির দেহজ বাসনা বা কামের পরিস্ফুট চিত্র যে কখনোই নিছক উত্তেজক অম্লমধুর গল্পমাত্রে পর্যবসিত হয়নি, বরং শিল্পের মাত্রা আশ্চর্য নৈপুণ্যে রক্ষা করেছেন গল্পকার—এর আসল কারণ, নরনারীর এই আদিম প্রবৃত্তির রূপায়ণই গল্পদুটির মুখ্য অন্বিষ্ট নয়। আর সেজন্য-ই এই সৎ ও বিবেকী লেখক যেমন অনায়াস ও অসংকোচ ভঙ্গিতে এই প্রবৃত্তির ছবি আঁকতে পেরেছেন, আবার তেমনি সহজ আয়াসহীনতায় তাকে অতিক্রম করতেও সক্ষম হয়েছেন। আর এখানেই, এই উত্তরণের মধ্যেই গল্প দুটির যথার্থ শিল্পসিদ্ধি।

'সুখ' গল্পের তরুণ সদ্যোবিবাহিত স্বামী-স্ত্রী শোভেন ও মীনার কাছে দাম্পত্য সুখের একটাই রূপ—সেটা মুখ্যত জৈব। শরীরী কামনার পূর্ণ চরিতার্থতা সে সুখের প্রধান উপকরণ। শোভেন সেই সুখটুকু পুরোপুরি উপভোগের আশায় নতুন এক নির্জন পরিবেশ নির্বাচন করেছিল। সুখের সব উপকরণই মোটামুটি প্রস্তুত ছিল, শোভেনরা জানতো তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই সেই নির্জন ডাকবাংলোয়। কিন্তু গোড়া থেকেই লেখক এব্যাপারে একটা চাপা রহস্যের আভাস দিয়েছেন: "কাল নজরে পড়েনি; আজ পড়ল।" কিন্তু আসলে ঘটনাটার মধ্যে কোন কিছু রহস্যই নেই। একেবারেই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। এক বৃদ্ধ দম্পতি ওই ডাকবাংলোয়ই একটা ঘরে রয়েছেন কিছুদিন থেকে। ঘটনা হিসেবে খুব সামান্য, সাধারণ। কিন্তু নায়ক নায়িকার (বিশেষ করে নায়কের) গূঢ় চেতনায় এই বৃদ্ধ দম্পতির

অস্তিত্ব নানা প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছে। চরম বিরক্তি থেকে এক গভীর বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতার এক পরম বেদনা—ডাকবাংলোর ঘরের আবছা আলোয় ক্রমশ এই তরুণ বয়সী স্বামী স্ত্রীর চেতনার অবচেতনে ছড়িয়ে পড়েছে।

যৌবন, জরা আর মৃত্যুর অনিবার্য আভাস—এই নানাবর্ণ প্রতিবেশে লেখক নিজেই যেন অন্বেষণ করেছেন শরীরী কামনা এবং দুঃখে কান্নায় শুদ্ধতায় ওঠা সেই চেতনা, যার নাম বুঝি প্রেম—এই দুয়ের মধ্যকার গূঢ় আশ্লিষ্ট সম্পর্ককে! দুটি তরুণ নরনারীর দেহের তপ্ত কামনাই একদিন অনেক দুঃখ বেদনা সহিষ্ণুতার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে অপরাহ্ণ বেলায় উত্তীর্ণ হয় আরেক স্তরে, সুখের জন্য ব্যাকুল নারী ও পুরুষের জীবনকে পৌঁছে দেয় আরেক পরম অনুভবের তীরভূমিতে, যেখানে দুঃখ আর সুখের চেতনা মিলেমিশে একাকার। যৌবন আর জরা—জীবনের দুটো প্রান্তকে একেবারে পাশাপাশি ধরে দিয়েছেন লেখক দুয়ের মধ্যে এক অপরূপ মেশামেশির অনুভূতি। যৌবনে অধিষ্ঠিত থেকেই শোভেন আর মীনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বার্ধক্যের বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ জগৎটাকে। কামের চেতনায় আক্রান্ত হয়েই হৃদয়ের গভীরে অবলোকন করছে অক্লান্ত সেবা আর অগাধ মমতার রঙে আঁকা এক অপরূপ ভালোবাসার অপার্থিব ছবি।—"শোভেন নিজেই বুঝতে পারল না—তার কাম কখন কান্নায় ধুয়ে যাচ্ছিল।"

'আয়োজন' গল্পে বিমল কর বাইরের যৌনতার নেশায়-রঙিন প্রচ্ছদের নেপথ্যে যন্ত্রণাদীর্ণ মনের আর্তিকে আরো কঠিন নির্মোহ বাস্তবতার রূপ দিতে চেয়েছেন। স্ত্রী মনোবীনার কামকলার আড়ালে আছে বুকচাপা রুদ্ধ এক কান্নার সমুদ্র। সন্তানহীনতার গূঢ় বেদনা থেকে এসেছে স্বামীকে প্রলুব্ধ করে কামে আচ্ছন্ন করার তীব্র প্রণোদনা। আবার সবশেষে সেই রতি বিলাসের নিহিত উদ্দেশ্য, সকল আয়োজন, সব ছলনা যখন ধরা পড়ে গেল, তখন সেই কামনার উগ্রতার রক্তিম ছবিটিকে লেখক স্বচ্ছ শুদ্ধ করে দিলেন কান্নায় ধুয়ে। নির্জন বৃষ্টি-ঝরা রাত্রির নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মর্মদাহী এক স্মৃতির (একমাত্র শিশু-সন্তানের মৃত্যুর) পথ পেরিয়ে চেতন-অবচেতনার সন্ধিস্তরে ওই নিঃসন্তান নারী এক অনাস্বাদিত তির্যক বাৎসল্য রসের স্বাদ পেল। জীবনের সেই অনালোকিত রহস্য ভুবনের দ্বার দৃঢ় অবিচল নিরুচ্ছ্বাস হাতে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন লেখক।

বস্তুত, 'সুখ'-এর চেয়ে 'আয়োজন'-এর সমস্যার বাস্তবতা আরো বেশি

প্রত্যক্ষ, আরো কঠিন নির্মম। প্রথম গল্পের নায়ক শোভেনের কাছে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি কিছুটা রোম্যান্টিক বিষাদের রূপ নিয়েছে। কিন্তু 'আয়োজন'-এর শেষে মনোবীনার চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা, স্বামীর কাছে হঠাৎ তার ছলনার ছদ্মবেশের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাওয়া—এ একেবারে মর্মান্তিক নিষ্ঠুর বাস্তব সন্দেহ নেই।

আমাদের সময়-সমাজের কঠিন বাস্তবতার একটা দিক এভাবেই বিমল করের ইদানীং কালের কোন কোন গল্পে ফুটে উঠেছে। কিন্তু আগেই বলেছি, বিমল কর জীবনের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য সন্ধানী শিল্পী। জীবন সম্পর্কে এক ধরণের মৌল গভীর দৃষ্টিকোণ আছে তাঁর, তা থেকে কখনই তিনি একেবারে দূরে সরে যান না। প্রেম কাম ও মৃত্যু-চেতনা কিংবা বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা ও বিষাদবোধ এরকম একটির সঙ্গে আরেকটি চেতনার গিঁট বেঁধে গড়ে তোলা তাঁর যে সমগ্র জীবন বোধের বৃত্ত—তারই মধ্যে শিল্পরূপ পেয়েছে এই গল্প দুটির ভাব-সংবেদন। আসলে এ গল্প দু'টির কোনটিই শেষপর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস-ভঙ্গের কিংবা দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার ঠিক 'যুগধর্মী' কাহিনী হয়ে ওঠেনি: কিন্তু এ-ও ঠিক যে এই দু'টি গল্পে-ও দাম্পত্য সম্পর্কের রূপান্তরের সংকেত আছে। কিন্তু সে রূপান্তর একান্ত স্থূল ও প্রত্যক্ষ নয়। তা গভীর এবং গূঢ়। পাঠক শুধু এটুকু অনুভব করেন যে, গল্পের আরম্ভে শোভেন ও মীনা কিংবা পশুপতি ও মনোবীনার মধ্যকার যে-সম্বন্ধ ছিল, গল্পের শেষে ঠিক তা নেই। সেখানে অলক্ষ্য কিন্তু নিশ্চিত এক রূপান্তর ঘটে গেছে। দুটি গল্পেই দেখছি দাম্পত্য সুখের নিবিড়তম মুহূর্তটি এক বিচিত্র বোধের শায়কে বিদ্ধ হচ্ছে। সেই বোধের স্বরূপটি বড় রহস্যময়। তাকে এক কথায় নিছক দুঃখ বলা চলে না। যদিও দুঃখের অনুভব অবশ্য-ই তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেই বোধের সংস্পর্শে স্বামী স্ত্রীর মন এক ধরণের অনিবার্য নিঃসঙ্গতা ও বিষাদে আক্রান্ত হচ্ছে, তীব্র বাসনা ও সম্ভোগ দিয়ে গড়া জীবনের যে মৃত্তিকা তাদের পায়ের তলায় দৃঢ় ও নিশ্চিত ছিল, তা যেন ক্রমেই সরে সরে যাচ্ছে। জীবনকে এই চোখে দেখা এবং এর শিল্পিত প্রকাশের মধ্যেই নিহিত বিমল করের লেখক সত্তার একান্ত স্বকীয়তা। আলোচ্য গল্প দুটির দর্পণে লেখকের সেই ব্যক্তিত্বেরই নির্ভুল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে।

অন্তর্বাস ॥ ডিলান টমাস

অনুবাদ : স্নেহাকর ভট্টাচার্য

সে কলিংবেল বাজালো। কোনো উত্তর নেই। মহিলা এখন বাইরে।

সে চাবিটা ঘোরালো।

শেষ বিকেলের আলোয় হলঘরটায় অসংখ্য ছায়া ; ঘরটা ছায়াতে ভর্তি। সবগুলো ছায়া মিলে প্রায় একটা জমাট আকৃতি নিয়েছে। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে সে কোট আর টুপিটা খুললো, যাতে জমাট ছায়ার আকৃতিটা দেখতে না হয়।

—বাড়িতে কেউ আছে ?

ছায়াগুলো তাকে বিমূঢ় করে তুলছে। মহিলা বাড়ি থাকলে এগুলোকে ধুলোর মতোন ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিত।

বসবার ঘরে ঢুকতে নিবুনিবু আগুন। ঘরে ঢুকে সে বসলো। হাতদুটো ঠাণ্ডা। ঘরের চারপাশ আলোকিত করতে চুল্লিতে আগুন দরকার। বাড়ি ফেরার পথে সে একটা কুকুরকে গাড়িচাপা পড়তে দেখেছে। রক্তের দৃশ্য তার খুব অস্বস্তিকর লেগেছে। রাস্তার মাঝখানে হাঁটুগেড়ে বসে ওই চাপ চাপ রক্ত আঙুল দিয়ে ঘাঁটতে ইচ্ছে করছিল। কে যেন তার শার্ট টেনে ধরে জানতে চাইল সে অসুস্থ কিনা। গলার স্বর ও শক্তি সেই ইচ্ছাটাকে চাপা দিয়েছিল বলে মনে পড়ছে। সে রক্তের কাছ থেকে সরে এসেছিল। কিন্তু রক্তমাখা চাকা আর বনেটের নীচে সিক্ত কালিমা কেবলই চোখের সামনে ঘুরছে, শুধু ঘুরছে। একটু উত্তাপ দরকার। বাইরে বাতাস আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেন কেটে বসেছে।

মহিলা তার সেলাইয়ের জিনিষপত্র কার্পেটের ওপর রেখে গেছে। একটা শেমিজ তৈরী হচ্ছে যেন। সে হলুদ পোষাকটায় হাত বুলিয়ে স্তনদুটি কোথায় থাকবে বুঝে নিতে চাইলো। সকালে ব্রুক পরার সময় মাথাটা ঢেকে গিয়েছিল, মহিলাকে তার নগ্নতায় শীর্ণ দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটা চামড়ার থলে ও মেহেদী গাছের ঝাড় আলো থেকে দূরে সরে সরে যাচ্ছে। সে শেমিজটাকে মেঝেতে ফেলে দিল।

কেন রক্তের ও কুকুরটার তালগোল পাকানো শরীরের দৃশ্য চোখে ভাসছে, সে অবাক হয়ে ভাবলো। কোনো জীবন্ত প্রাণীর চৌচির খুলি থেকে ঘিলু বেরিয়ে আসার দৃশ্য সে এই প্রথম দেখেছে। শেষ চীৎকার শুনে ও কুকুরটার পাঁজর হঠাৎ ধসে যেতে দেখে তার বমি পাচ্ছিল। বালকের হাতে পতঙ্গের মতো সেও তো মরে যেতে এবং এমনি চীৎকার করে উঠতে পারতো। হাজার রাত্রি আগে সেই নারী তার পাশে শুয়েছিল। নারীর বাহুতে মাথা রেখে সে শুধু ভিতরের হাতের কথা ভেবেছে। সে শান্তভাবেই কঙ্কালের পাশে শুয়েছিল। কিন্তু সকাল হলে নারী আবার তার দূষিত মাংস নিয়ে জেগে ওঠে।

শুধু নিজের যন্ত্রণা চাপা দিতেই সে নারীকে আঘাত করে। শুধু মাথার কষ্টটাকে চুরমার করার জন্যে সে আঘাত করে চলে যতক্ষণ না গালে রক্ত ফেটে পড়ে। মেয়েটি তাকে ওর মায়ের মৃত্যুর কথা বলেছে। মুখের ক্ষতগুলো ঢাকতে ওর মা নাকি মুখোশ পরে থাকতো! সেই অসুখের পদপালের আক্রমণ সে তার মুখে ও চোখের পাতায় ওঠানামায় অনুভব করলো।

ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আগুনটা খুঁচিয়ে দেবার শক্তিও যেন নেই সে বড়ো ক্লান্ত। রাত্রির সঙ্গে শীত ঘরে ঢুকছে। আগুনের মৃত্যুর ক্ষুধা সে দেখলো। শেষ শিখাটি তার জিভের ডগা পর্যন্ত উঠে আসতে সে ওটাকে গিলে ফেললো। হৃৎস্পন্দনের চারপাশে আগুনের শিখাটি ঘুরছে। তারপর সেটা শুধু শব্দ এবং অভিশপ্ত মানুষের সবরকম যাতনা হয়ে গেল। মুখের ওপর একটা বোতল চুরমার হবার কষ্ট, বাছুরের জন্মের সময় গাভীর কষ্ট, কুকুরটার কষ্ট—এইসব কষ্ট তার ভিতর দিয়ে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ছুটে যাচ্ছে।

শক্তি ফিরে এলো। সে এবং জন্মমুহূর্তের বাছুর, ক্ষতবিক্ষত মুখের মানুষ এবং কুকুর—সবাই মিশে যেন একটা শরীর পেলো। যেন একই অবয়ব আর একটাই রক্তবর্ণ মগজ বাতাসের পশুকে স্পর্ধার সঙ্গে আহ্বান করছে। যখন তার মহিলা ঘরে ঢুকছে সে সেই স্পর্ধাকে আঙুলের তুড়িতে শুনতে পেলো।

—অন্ধকারে বসে আছো কেন, মহিলা জিজ্ঞেস করলো।

মহিলা স্টোভ ধরাতে রান্নাঘরে ঢুকলো। সে চেয়ার থেকে উঠে অনুসরণ করলো। মহিলার হাতে দেশলাই। একটা মরাকাঠি ঘষবার সঙ্গে সঙ্গে সে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো।

—জামাকাপড় খোলো, সে বললো।

কথাটা ঠিক শুনতে না পেয়ে মহিলা হাসলো।

—জামাকাপড় খোলো।

হাসি মিলিয়ে গেল। মহিলা দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো।

—জামাকাপড় খোলো।

দুহাত পিছনে করে সে এগিয়ে এলো। মহিলা স্টোভের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সে ফুঁদিয়ে দেশলাই নিভিয়ে দিলো।

—কি, কি চাও? মহিলাকণ্ঠ।

ঠোঁটের শব্দহীন কম্পন উত্তর দিলো।

সে মহিলার গালে মৃদু চাপড় দিয়ে আবার বললো, জামাকাপড় খোলো।

মাথার ওপর দিয়ে ফ্রক খোলার খসখস শব্দ, ভীত ফোঁপানির শব্দ, সবই সে শুনতে পেলো। অন্ধ হাত নারীকে সঠিকভাবে নগ্ন করলো।

সে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দরজাটা বন্ধ করলো।

হলঘরটায় ছায়ার যুগ্মতা ভেঙে গেছে। স্কার্ফটা গলায় জড়িয়ে টুপির চারপাশে টোকা দিতে দিতে সে আয়নায় তার মুখ দেখতে পেলো না। অসংখ্য মুখ। প্রত্যেকেই যেন তার মুখের কোনো না কোনো আদল ও একগোছা করে চুল পেয়েছে। কোটের কলারটা সে তুলে দিলো।

শীতের শিক্ত রাত। হাঁটতে হাঁটতে সে ল্যাম্পপোষ্টগুলি গুণতে লাগলো। একটা দরজা ঠেলে ভিতরের উষ্ণতায় ঢুকলো। ঘরটা ফাঁকা। কাউন্টারের স্ত্রীলোকটি হেসে বললো, জবর ঠাণ্ডা পড়েছে।

চো-করে হুইস্কি গলায় ঢেলে সে আবার বেরিয়ে এলো।

বৃষ্টি ক্রমশ জোরে আসছে। সে হাঁটছে। ল্যাম্পপোস্টগুলি আবার গুণতে লাগলো। কতগুলো হলো কে জানে।

আর একটা ফাঁকা পানশালা। সে গেলাস নিয়ে লবিতে চলে এলো, লবিও ফাঁকা। উদীয়মান সূর্যও ফাঁকা।

বাইরে যানবাহনের কোনো শব্দ নেই। তার মনে পড়লো যে সে রাস্তায় কোনো মানুষজনও দেখেনি। নির্জনতায় আতঙ্কে সে চীৎকার করে উঠলো, তুমি কোথায়? কোথায় তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় যানবাহন চলাচল শুরু হলো, জানলায় আলোর ঝলকানি দেখা গেলো, বাতাসে গান ভেসে এলো।

পানশালা ভরে উঠেছে। লোক গিজগিজ করছে। মহিলারা জোরে কথা বলছে, হাসছে। মদ চলকে পোষাকে পড়ছে। মেয়েরা কাঠের গুঁড়ো

ছড়ানো মেঝেতে নাচছে। একজন মহিলা তার ডানা ধরে ব্রাউজের হাতাটা তার মুখে ঝুলিয়ে দিলো। মহিলাদের হাসি ও নৃত্যরত মেয়েদের উঁচু গলা ছাড়া সে কিছুই শুনতে পাচ্ছেনা।

সেই কদাকার মহিলারা চেয়ার ছেড়ে উঠে দুলে দুলে তার দিকে এগোতে লাগলো। সারা ঘর ভর্তি মহিলা। তারা হেসে হেসে তার চারপাশে বীন হয়ে এলো।

সে ফিসফিস করে একটা শব্দ উচ্চারণ করলো। বমির পুরনো ভাবটা পেটে পাক দিয়ে উঠছে। তার চোখের সামনে রক্ত।

তারপর সেও হো-হো করে হেসে উঠলো। কোটের ভিতর হাতদুটো ঢুকিয়ে সোজাসুজি ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে ভেঙে পড়লো।

পকেটে নরম কী একটা জিনিষ। পকেট থেকে হাত তুলে আনতে সেই নরম জিনিষটাও উঠে এলো।

কলরোল মরে গেলো। সমস্ত ঘর স্তব্ধ। নির্বাক মহিলারা তার দিকে সতর্ক চোখ রেখেছে। সে তার হাত চোখের সামনে তুলে ধরলো, হাতে একটুকরো নরম কাপড়।

—স্ত্রীলোকের এই অন্তর্বাস কে কিনবে? সে চেঁচিয়ে উঠলো। এক—দুই —হে মহিলাগণ, কে এই অন্তর্বাস কিনবে?

গেলাস হাতে ভীরু ও সাধারণ মহিলারা পানশালায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কাউন্টারে হেলান দিয়ে চেঁচিয়ে হুলুস্থুল ক'রে, হেসে, সে ওই রক্তাক্ত বস্ত্রখণ্ড মহিলাদের সামনে দোলাতে লাগলো।

রক্তের ঋণ

অমিয় রায়চৌধুরী

থলথলে গোল মুখ, তিনভাঁজ চিবুক। গায়ে চাপানো কালো গাউনটা বিবর্ণ। পুরনো ছাতার কাপড়ের মতো। চশমাটি কিন্তু চকচকে। মোটা ফ্রেম, মোটা কাঁচ। চশমাহীন উকীল ভাবা যায় না চশমাতেই পসার।

স্নেহ মাখানো তিরস্কার দিয়ে সুরু। ছিঃ ছিঃ এই বয়সেই খারাপ জায়গায় যাতায়াত সুরু করেছে।

আমার মাথায় রক্ত। হাত জলন্ত পাথর। ইচ্ছে করছিল ঠাস্ করে চড় মারি। মুখটাকে লম্বা করে দিই। কী বোকা বোকা কথা! এই বুদ্ধি নিয়ে ঢালায় কী করে? খারাপ জায়গায় যাওয়ার আবার বয়েস আছে না কি? মানুষ চিরকালই খারাপ জায়গায় যাবে, খারাপ কাজ করবে এ সব তো জানা কথা। জেনেই অপরাধীর দর্শন পাবার জন্যে হা পিত্যেস করে বসে থাকো তোমরা।

না লোকটা বোকা নয়। আমার ধারণা পাল্টাতে হল। বেশ ঝানুই মনে হল লোকটাকে। জ্ঞান দেওয়া? ওটা বয়সের দোষ। ভালো বক্তা। ইংরিজি ভাষার ওপর ভালো দখল। বেশ গুছিয়ে বললো কথাগুলো। নাবালক-মনস্তত্ত্ব আদর্শ ফাদর্শ, সমাজ ব্যবস্থা, যুগযন্ত্রণা ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবগর্ভ বক্তৃতা। লর্ড দারুণ অভিভূত। অতএব বেকসুর খালাস বিনিময়ে দশটাকা জরিমানা। অবিশ্যি উকীল বাবুর শেখানো মিথ্যে কথাটা আমাকে বলতে হয়েছে। ও পথ মাড়াবো না কোনোদিন।

ট্যাক্সিতে ফিরছিলাম। মা আর আমি। মা সিটের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। রাস্তার দিকে চোখ। উদাস দৃষ্টি। চোখে জল। কাঁদলে বেশ লাগে মা'কে। কসমেটিকস্ গলে জলের ফোটাগুলো কেমন রঙীন হয়ে উঠেছে। মা বেশ সেজে গুজেই এসেছেন। চেহারা দেখলেই মালুম হয় বড় ঘরের বউ। ওই মায়ের ছেলে আমি। বড় ঘরের ছেলে। বড় ঘরের ছেলেরা ছোট কাজ করে না। কদাচিৎ পা পিছলোয় হয়তো। জানি না আমার ছাড়া পাবার মূলে মায়ের ও কোনো ভূমিকা ছিল কিনা।

কি হলো তোমার ? এ দিকে মুখ ফেরাবে না ? ঘেন্না হচ্ছে ? ছেলে খারাপ মেয়েমানুষের বাড়ি ফুর্ত্তি করতে গিয়েছিল ? পুলিশ ধরেছিল ? তাই ?

কি করবো বলো ? ভালো খারাপের বোধটাই যে আমার হল না। মনে আছে তোমার সেই সব দিনগুলোর কথা ? যখন আমার হাত পা ছোট ছিল, মাথাটা ও ছোট ছিল। আমাকে একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাবা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতেন। তারপর মারতেন তোমাকে। মাথাটা ছোট ছিল ঠিক বুঝতাম না কেন বাবা তোমাকে মারতেন। পরে বুঝেছি। এই করেই বাবা তোমার গা থেকে একটি একটি করে গয়না খুলে নিয়েছিলেন। আমি রাগে ফুলতাম, দরজার গায়ে ঘুষি মারতাম, লাথি মারতাম। কিন্তু দরজা ভাঙতো না। আমার হাতে পায়ে যে জোর ছিল না তখন। ভাবতাম তখন, ফুঁসতাম তখন—আমার হাত দুটো বড় হোক বাবাকে ঠিক একদিন গলা টিপে মেরে ফেলবো।

তারপর আমার হাত দুটো বড় হল, পা দুটো বড় হল, শরীরে শক্তি এল কিন্তু বাবাকে গলা টিপে আর মারা হল না। বাবার তখন আর তোমাকে মারার ক্ষমতা নেই। তোমার গায়েও তখন আর গয়না নেই। বাবা একদিন বিছানায় শুয়ে পড়ল আর উঠে দাঁড়াল না। প্রথমে বুকে যন্ত্রণা তারপর হাত পা কোমর অবশ। পক্ষাঘাত। কালীপুজোর মহাদেবের মতো রাত্রদিন শুয়ে থাকা লোকটাকে দেখলে এখন শুধু করুণাই হয়। সব কিছুর জন্যেই এখন উনি পরের ওপর নির্ভরশীল। দাম্ভিক অত্যাচারী লোকটা এখন সম্পূর্ণই তোমার আর আমার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

বাবার চাকরী গেলো। ওষুধে ডাক্তারে খেল অফিস থেকে পাওয়া টাকা-গুলো। ইতিমধ্যে সেই মারধোরের পিরিয়ডে আমার দুটি ভাই জন্মাল। সংসারটিকে বাড়িয়ে বাবা রিটায়ার করলেন। দুর্ভিক্ষের রাক্ষুসিটা তখন আমাদের বুকের ওপর চেপে বসেছে। বেশিদিন নয় অবিশ্যি। বাবার অফিসের লোকেরা তদ্বির তদারক করে তোমার চাকরী জুটিয়ে দিল। বাবার পোস্টে নয়, একেবারে নিচের ধাপের কেরানী। তুমি হলে কেরানী আর আমি হলাম নার্স। বাবার প্রাণটায় মতই সংসারটা আমাদের ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে চলছিল।

অলক্ষ্যে অনেক জিনিস ঘটে যায় হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে। সে দিন অবাক হবার পালা। অবাক মুগ্ধদৃষ্টিতে একদিন দেখলাম তোমার জীর্ণ শরীরে কখন শ্রী এসে জাঁকিয়ে বসেছে। মসৃণ ত্বক, গিনি সোনার মতো রঙ,

আয়ত চোখের মাদক দৃষ্টি। যখন তুমি অফিস যাও আমি অবাক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোমায় দেখি। ভাতে। গেঞ্জীর মতো ব্লাউজ আর রেশমী শাড়িতে তোমায় দারুণ লাগে।

তোমার ঠোঁট দুটি বাঁকা হয়ে উঠল বে। সত্যিই আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি। মা'র শরীরের দিকে কি তাকাতে আছে? শাস্ত্রের মানা। শাস্ত্র ফাস্ত্র বুঝি না। মা ও তো মেয়ে মানুষ, ভুলতে পারি না যে। মেয়ে মানুষ বলেই না এই সংসারের ভার বইতে পারছো তুমি। সংসারের ভারটা তো কম নয়। কত ভার? হনুমানের ঘাড়ের পাহাড়টার মতো কি? হবে বোধ হয়। পক্ষাঘাতে শুয়ে থাকা স্বামী, স্কুলে পড়া দুটি অপোগণ্ড আর বকে যাওয়া এই অধম।

মনে হচ্ছে প্রাণ থাকতে তুমি আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না। কিন্তু জানি তুমি বলবে। তোমার স্বভাব তো জানি। বাড়ি ফিরে মুখ তোমার এক সময় খুলবেই। আর যখন খুলবে তখন আর থামতে চাইবে না। তখন পরোক্ষে বাবাকে এবং প্রত্যক্ষে আমাকে ও আমার ভাইদের বলবে নক্কর, স্বার্থ পর। আরো অনেক কিছু। ঠিক, আমরা তোমার শত্রু। আমরা স্বার্থপর। তোমার রক্ত জল করা পয়সায় কী নিদারুণ অপচয়! নতুন লাইন পাতা হয়েছে। গাড়ি প্রস্তুত। তবু স্টার্ট নেওয়া যাচ্ছে না। ঘুরে ফিরে এই গহ্বরে ফিরে আসতে হয় তোমাকে।

কেন? সংস্কার? অভ্যাসের টান?

জানি না। শুধু জানি অফিসে তোমাকে খুব খাটতে হয়। ইনডোর আউটডোর। আউটডোর ডিউটি করতে গিয়েই তো অফিসে গোলমাল বাঁধিয়েছিলে। মেয়েমানুষ না হলে চাকরীই চলে যেত। তোমাকে শুধু ওয়ার্নিং মেমো ধরানো হয়েছিল। এক ডিপার্টমেণ্ট থেকে আর এক ডিপার্টমেণ্টে বদলী। পানিসমেণ্ট তোমার কাছে ব্লেসিং হল। তুমি ভালোই জানো এখানে কেউ রিপোর্ট করবে না। যতই হোক চামড়ার শরীর তো। সেই যে দুটি যুবক সুপারিনটেনডেণ্টকে লাশ ফেলে দেবার হুমকি দিয়েছিল। সেই থেকে সবাই তোমাকে ভয় করে, এড়িয়ে চলে।

ওরা কারা? ডাক্তারটাই বা কে? যার কাছে তোমাকে রোজ যেতে হয়? তোমার শরীরে কোনো রোগ আছে বলে তো জানি না। বোকার মতো বললাম। মানুষের সব রোগের নাম কি জানি?

তুমি আজকাল একটা ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে অফিসে যাও। তাতে কসমেটিকস্ ছাড়াও শাড়ি, টুথপেস্ট, ব্রাশ থাকে। সত্যি তোমার মতো এমন সৌখীন মা ক' জনার হয়।

সত্যিই তোমার মতো মা হয় না। তোমার প্রায়ই ফিরতে দেরী হয়, বাবাকে ছেড়ে আমি বেরোতে পারি না,—সেই সব দিনে সন্ধ খুন করা উদভ্রান্ত মানুষের মতো চেহারা দেখে তুমি আমাকে বুঝতে পারো। না চাইতেই আমার হাতে টাকা তুলে দিয়ে তুমি বলো, যা বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখে আয়।

টাকা জিনিসটা বড় মজার। টাকা না হলে শালা কিছুই হয় না। ও জিনিস না পেলে ও সুখ নেই পেলে ও সুখ নেই।

যেমন মা মণি, আপাততঃ আমার একশোটি টাকা চাই।

এই তো। জানি কথা তোমাকে বলতেই হবে। টাকার প্রসঙ্গ উঠল যে। টাকা মুক কে ও বাক দেয়।

—না টাকা পাবে না। টাকা পেলেই তুমি আবার খারাপ জায়গায় যাবে। আবার পুলিশের ঝামেলা।

অবুঝের মতো কথা বলো না মা। ভালো জায়গায় যেতে যে অনেক টাকা লাগে। ভেবে ভাখো তুমি নিজে কত টাকা পাও। ঠিক অত টাকা দিতে পারলে রত্নাকে নিয়ে আমি ঘুরতে পারি, পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে যেতে পারি। তোমরা যাদের ভালো মেয়ে বলো সেই সব মেয়েরা আমাকে বিয়ে ও করবে না সঙ্গ ও দেবে না। কেনই বা দেবে ? আমি কি খাওয়া পরা দিতে পারবো ? তাহলে ? আর পুলিশের ঝামেলা ? পুলিশ কি আর রোজ রোজ ঝামেলা করে ? টাকার টান পড়লেই করে। রোজ রোজ ঝামেলা করলে দু' পক্ষেরই ব্যবসা লাটে উঠবে।

ঘরে থাকতে আমার ভালো লাগে না। বাবার সেই এক কথা। তুই মানুষ হলি না। আমার হাসি পায়। হা-হা শব্দের ঢেউ তুলে ঘর ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মানুষ যে কাকে বলে তা তো বুঝলাম না। কে আমায় শেখাবে ? বাবা ?

না না ওঁকে আমি আর সহ্য করতে পারি না। কে যেন ওঁর গায়ে মৃত্যুর নোটিশ লেপ্টে দিয়েছে। গায়ে কেমন সাপ সাপ গন্ধ। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তাই তো সেবারে পালিয়েছিলাম।

টাকাটা যদি দাও তো আমি সেখানেই চলে যাবো। জায়গার নাম এখন বলবো না। তবে হ্যাঁ একজন মেয়ে মানুষের কাছেই যাবো। সে মেয়ে কিনা জানি না। বয়স তার তোমারই মতো হয়তো হবে। তবে তোমার মতো সুন্দরী সে নয়। সুপার ব্ল্যাক। স্থূল। সেক্সি। জলন্ত আগ্নেয়গিরি। মনটা কিন্তু মায়াপ্রবণ। আমার প্রথম শরীরী দীক্ষা ওরই কাছে।

দশটা কচুরি আর দু'গ্লাস জল খেয়ে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা পেলাম তখন সটান ওর কাছে চলে গেলাম। দোকানে ঢুকেই বুঝেছিলাম ওই মহিলাই প্রোপ্রাইটার। চৌকির ওপর বসে ক্যাশ বাক্স সামনে নিয়ে কালো পেটমোটা যে লোকটা টাকা পয়সা নিচ্ছে, হুকুম করছে সে হচ্ছে ম্যানেজার। ম্যানেজারের চৌকির পাশে একটা চেয়ারে বসে পান চিবুচ্ছে, পা দোলাচ্ছে আর সব দিকে নজর রাখছে এই মহিলা। পা নাচাবার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় ও-ই মালকিন।

—দশটা কচুরি খেয়েছি, পয়সা নেই। কাজ দিলে কাজ করে শোধ দিতে পারি।

দু'জনেই বড় বড় চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ে ওরা তখন মূক। কিছুক্ষণ পরে মালকিন ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে বলল, মালুম হোতা হ্যায় ভদ্দরলোক, বংগালী। জিজ্ঞেস করলো এঁঠো পাতা পরিষ্কার করতে পারবো কিনা। এত সহজে চাকরী পাওয়া যায় ধারণা ছিল না। লেগে গেলাম কাজে। চলছিল বেশ। খাওয়া থাকা ফ্রি। মাস গেলে কিছু মাইনেও নিশ্চয় দেবে।

তৃতীয় দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি পাঞ্জাবীর পকেটে স্কুল ফাইন্যালের সার্টিফিকেটটা নেই। দারুণ ভেঙে পড়লাম। কাগজটার বাজার দর যাচাই করার আর কোনো সুযোগ রইল না। গুম মেরে বসেছিলাম! একটু পরে আমারই মতো একজন চাকর এসে খবর দিল মালকিন আমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

দোকানের লাগোয়া খোলার চাল দেওয়া মাটির ঘরে তক্তপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে মালকিন বসে আছে। দেখলাম চোখে রহস্যের ঝিলিক। এই ভোর রাতে আমাকে ডেকে পাঠানোর কারণ নিয়ে যখন আমি আকাশ পাতাল ভাবছিলাম তখন ও আমার দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে গেল ওর বুকের কাছে। ব্লাউজের ভেতর থেকে ভাঁজ করা একখানা কাগজ আমার সামনে মেলে

ধরলো। আমি চিলের মতো ছোঁ মেরে কাগজটা ওর কাছথেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম কিন্তু পালাতে পারলাম না। বাজপাখীর মতো তীব্র দ্রুততায় ও আমার মণিবন্ধ সজোরে ধরে ফেললো। মেয়ে মানুষের গায়ে এত শক্তি থাকতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

সেই দিন থেকে ম্যানেজার বদলী হল অন্য ডিপার্টমেণ্টে। আমি হলাম ম্যানেজার, ক্যাশবাক্স হ্যাণ্ডল করার অধিকারী। শুধু কি তাই। মালকিনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশানের অদ্ভুত নিয়ম। সেইদিন রাত থেকে আমার শোওয়ার জায়গা হল মালকিনের বিছানায়। এত সুখ আমার সইল না। গোটা রাত ও আমায় জাগিয়ে রাখতো। দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে আমার শরীর ভেঙে পড়ছিল। ভয় হচ্ছিল বোধ হয় মরেই যাবো। কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই।

পনেরো দিনের মাথায় সুযোগ এল। পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে ভেগে পড়লাম। তোমার জন্যে, বাবার জন্যে, ভাই দুটোর জন্যে মন কেমন করছিল। দূর থেকে বাস্তব নরককে কবিতার নরকের মতন সুন্দর মনে হয়। কিন্তু এখন মোহ আমার পাকাপাকি ভেঙে গেছে। কোনোদিন ফিরে না আসার জন্যেই এবার চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আপাততঃ ওই মেয়ে মানুষটার কাছেই ফিরে যাচ্ছি। এক নরক থেকে আর এক নরকে। টাকা ফেরৎ পেলে ও আমায় বিশ্বাস করবে। জানি কচি ম্যানেজার ওর খুব পছন্দ।

এখন কাঁদছ বটে কিন্তু আমি জানি এতে তোমার ভালোই হবে। বাবা আর ক' দিন? আরেকটি পথের কাঁটা নিজেই সরে যাচ্ছে। তোমার সামাজিক মর্যাদাও বাড়বে। লোকের কাছে তুমি বলতে পারবে ছেলেটা মানুষ হয়েছে। বাইরে চাকরী করছে, মাসে মাসে বাবাকে টাকা পাঠায়। হয়তো লোকের কাছে তুমি বলে বেড়াবে—একটা ভালো মেয়ের খোঁজ দিন ছেলেটার এবার বিয়ে দেব।

টাকাটা আমায় দাও। এই শেষ। তোমার ঋণ আমি শোধ করবই। যদি ও শুনেছি রক্তের ঋণ নাকি সহজে শোধ হবার নয়। বংশ পরম্পরা লেগে যায়। তবু স্বপ্ন দেখি। আমি আনৃণ্য। উন্নত শির, অনন্ত সূর্যের নিচে আমি হাঁটছি।

এই খেলা খেলতে

কালীকুমার চক্রবর্তী

বাইরে ঝুর ঝুর বাতাস। বয়স্ক হলুদ পাতা ঝরে যাচ্ছে, টুপটাপ। ধুলোবালি ঘুরে ঘুরে পাক খায়। এদিক সেদিক উড়ে যায়। নীচে বালির ঢিবিতে এখন বাচ্চা—কাচ্চাদের হুড়োহুড়ি, হৈ চৈ। বালি ছিটিয়ে খেলছে ওরা। ঘর ঘর খেলা। বালিতে পা ঢুকিয়ে মাস্ত আলতো সরিয়ে আনছে। তারপর হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠছে—ঘর, ঘর বানিয়েছি আমি। টোটনটা বোঝদারের মতো তুরন্ত চোখ মুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর ঠোঁট উল্টে তলসেয়ানার মতো মিন মিন করে—ধুৎ ঘর এমোন হয় নাকি ? এক লাথিতে ভেঙে ছায়। মাস্ত কেঁদে ওঠে, চেঁচায়—তুই বানা না, বানা দেখি।—বানাবো বানাবো বলেই পা দিয়ে বালি ছিটাতে থাকে টোটন। ওদের চোখে মুখে বালি নয় শীতের পড়ন্ত বিকেলে যেন চিক চিক করে অভ্র দানা।

রেলিঙে বাঁ কাতে ঝুঁকে থাকে নবেন্দু, চন্দ্রবিন্দুর মতো। মাথা থেকে কোমর অব্দি বাঁকানো। এই খেলা দেখতে দেখতে সে যেন টোটনকে নয়, নবু নামের এক কিশোরকে দেখতে পায়। যার দুহাতের তালুতে মুঠো ভরা স্বপ্ন, দুচোখের তারায় সূর্যধরার নাচন। সেই কাঁচা কিশোর আরেক উদ্দাম কিশোরী রাঙ্গাদি ওকে যেন ওলট পালট, অগোছালো করে দিতে চায়। একজন বিরাট প্রাসাদের সিঁড়িমুখে, আরেকজন মাঝ সিঁড়িতে পা বাড়ানো। ভেতরে কি সেই সম্পদ, কি বা গোপন রহস্য তাদের তা জানা নেই। মুখে নয় যেন হাবাগোবা চোখে অনেক কথা নিয়ে নবু রাঙ্গাদির দিকে তাকিয়ে। পান ভর্তি গাল খুলে জিভে ডান তর্জনির চুন লাগিয়ে রাঙ্গাদি বলতো—তুই একেবারে বৌ-কাওটা হয়ে যাবি নবু। যা মিনমিনে তাতে নিজের কিছুই রাখতে পারবি না। তার টকটকে ঠোঁটে চোখ রেখে নবু ঘুরিয়ে বলতো—তোমার বরকে তাই করবে নাকি রাঙ্গাদি। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতো

রাঙ্গাদি, তার মুখে। পরে দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় তা ভাসিয়ে রেখে প্রজাপতির মতো চোখের তারা নাচিয়ে হাসতো। টাকরা জিভে রস টেনে টেনে তৃপ্তিভরা গলায় বলতো—দেখিস, দেখিস তখনতো দেখতে পাবি। লাল গালের ভেতর রাঙ্গাদির দাঁতগুলো চকচক করতো। একটুও পানের ছোপ পড়তো না দাঁতে। নবু রাগ দেখিয়ে বলতো—তুমি অত পান খাও কেন? কুমারী মেয়েরা ওভাবে পান খায় নাকি? হাসতে হাসতে রাঙ্গাদি বলতো—দাঁত দেখে ছেলেরা বিয়ে করে নাকি রে? তাহলেতো ঠকে। আসল কথাতো স্বভাব, চালচলন। রাঙ্গাদি এইসব ছাড়া ছাড়া কথা গুলোতে বিশেষ জোর দিত। নবু বুঝতো, বুঝতো না।

এইসব ভাবনার তলে নবেন্দু টোটনের দিকে আলতো চোখ ফেলে রাখে। তাকে বকতে গিয়েও বকে না। কেন যেন বারণ করতে

—এ্যাই শোন, আমি একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরী হতে পারে। তোমার আর টোটনের ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে নিও। বলেই বেপরোয়া সিঁড়ি ভাঙে শান্তা, তরতরিয়ে। ব্লু নাইলেক্স পরেছে আজ, সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। বড় একটা সাজে না সে। তবু শরীরে যেন চোখ কাড়ার এক আশ্চর্য যাদু। তেজী পায়ে অহংকারী হেঁটে যাচ্ছে শান্তা। টোটনের দিকে তাকিয়েও তাকায় না। হঠাৎ একটা চিন চিন ব্যথা নবেন্দুর গলা বেয়ে বুকে তা, জলে যায়, যাকে বলে দহন। গলাটা শুকিয়ে আসে। একটা গেন্ডিলা আক্রোশ নিজের, শান্তার, ও পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ সুখের প্রতি যেন থাক উচিয়ে, ইচ্ছে হয় সব ভেঙ্গে চুরে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়ে কোথাও চলে যায়। এর চেয়ে বন্ধ জীবন বুঝি শান্তির। এখন চন্দনের অফিসে যাবে শান্তা। তারপর লেক-ময়দান বা সিনেমা টিনেমায়। নবেন্দুর আধিক দুর্বলতা, অক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকি, এমন কি এক সময় তাকে হয়তো নপুংসক প্রমাণ করে দেবে। তাদের অবৈধ মেলামেশার সপক্ষে যুক্তি খুঁজবে। হো-হা-হা তুমি দেখে যাও রাঙ্গাদি আমি কেমন বৌ-ছাওটা

মন খারাপ হয়ে যায়। এই সব সময়তে সে চোখ ঘোরায়, দূরে বিল্ডিংসের মাথায়, রাস্তাঘাট অলিগলির কোণায় কোণায় হলুদ কালো রোদের বিকেল টান। সুখের সকাল বুঝি অল্পস্থায়ী। খর দুপুরের পর বিকেল নামে তাড়াতাড়ি। কালরাতেই যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়েছিল শান্তা। ঘিনঘিনে গলায় চেচে উঠেছিল—আমার জন্য তোমার অনিচ্ছায় কিছু করার দরকার কী?

আহত প্রশ্ন করেছিল নবেন্দু—আমার ইচ্ছে নেই, বলছো কী তুমি ?—ঠিকই বলেছি, সব ব্যাপারে তুমি লোক দেখানো দায়সারা কাজ কর। অসন্তোষের মেঘলা আকাশে থমথম করছিল শান্তার মুখ। সেইদিকে তাকিয়ে নবেন্দু বিড় বিড় করে উঠেছিল—কি করে বুঝলে ? তেমনি তেতো উত্তর দিয়েছিল শান্তা —মেয়েদের কিচ্ছু বোঝাতে হয় না।- তুমি কী বলতে চাও বলতো ?—কি আবার, আমাকে পুরোপুরি ব্লাক মেইল করেছো। ওর কমনীয় চোখ মুখের খোলস পাল্টে সে দিকে বিপন্ন তাকিয়ে নবেন্দু জিজ্ঞেস করেছিল—তার অর্থ ? —মানে আর কি ? বিয়ের আগে সাধ-আহ্লাদ মিটিয়ে ফেলেছো। এখন আর আমাকে—কথা শেষ করে নি। বেজোড় পা ফেলে শান্তা বারান্দায়

এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের অর্থ নবেন্দু বোঝে। মেয়েদের সেই চিরকেলে রোগ। রাজাদি আর মিঠুর ব্যাপার। তা নিয়ে অযথা সন্দেহ। অথচ খোলাখুলি কিছুই বলে না সে। নবেন্দুই বলেছিল—রাজাদি তার কৈশোরের সাথী আর মিঠু তার বন্ধু। সাথী ও বন্ধু শব্দ দুটোকে চিবিয়ে চিবিয়ে শান্তা বলেছিল— একটা ছেলের মেয়ে সাথী, মেয়ে বন্ধু ? নবেন্দু আর কথা বলতে পারে নি। এক ঢিলে যেন একটা অসহায় পাখী ওর বুকে ডানা ভেঙে লুটিয়ে এর পর থেকেই ওরা যেন এক নদীর দুই স্রোত। একটা বাইরে, আরেকটা ভেতরে ভেতরে।

অজান্তে কখন যেন গুটি গুটি সন্ধ্যা নেমে আসে চোরাবেড়ালের মতো। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ীর আগা মাথায় বিধবার চোখের মতো স্থির আলো, চুপচাপ ঝিমিয়ে, নবেন্দু পায়ে পায়ে ঘরে ঢোকে। টোটন উপরে উঠে এসেছে, হয়তো অনেকক্ষণ। ধুলোবালি শুদ্ধ বিছানায় শুয়ে আছে উবুড় হয়ে। ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। কিছুক্ষণ আগেও সে বইয়ের পাতা মুড়ে মুড়ে ভাঁজ করছিল। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে খেলছিল। ছেলেটার কিছুই হবে বলে টোটনের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকে নবেন্দু। বড় হয়ে সেও কি নবেন্দুকে দায়ী করবে ? করুক। সে এইবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলায়। সব জায়গায় শান্তার পোষাকী সংসার। আপাতঃ শান্তির ছাপ বাইরে সব আছে অথচ কিছুই নেই। এই সময় মিঠুর কথা মনে পড়ছে তার—নারে বাবা, বিয়ে থা করে মরবো নাকি।—কেন বিয়ে করে সবাই মরছে নাকি ?—সবার কথা জানি না, তবে অনেকেই নিজের অনেক কিছু ছেড়েছুড়ে শুধু এডজাষ্ট করে যাচ্ছে।— 'ওটাইতো জীবন !—কোন্‌টা জীবন, কোন্‌টা জীবন নয় এক কথায় তা কি

মেনে নেওয়া যায় নবুদা ? বলেই সে দুপুরবেলার ঝিম ধরা পায়রার মত ধূসর চোখে তাকিয়ে, সেই দৃষ্টিতে বিষাক্ত হল যেন। তার বুকে ফুটিয়ে, দংশনে যেন নবেন্দু কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ছটফট করছিল। তবু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কাঁই-কুঁই করে উঠেছিল—না, মানে জীবনের তো একটা সংজ্ঞা থাকে।—থাকে না নবুদা, কিছুই থাকে না। আমাকে দেখছো না ? আমার চাওয়াতো খুব সামান্য কিন্তু দেখলে তো কত বেশী আমি পেয়ে গেলাম। মিনুর চোখে মুখে যেন একঝলক আগুনের ভাঁপ। ভাঁপ ঠিক নয়, পুড়ে মরার কাতরানি। তাও যেন ঠিক নয়, প্রচ্ছন্ন অভিযোগ, যেন বলতে চায়—তুমিওতো কথা রাখতে পারলে না নবুদা। আসলে ভুল করেছে নবেন্দু। ঠিক সোনা ঠিক জহুরীই চিনে নিতে পারে, আর কেউ না।

আবার ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সে, বাঁ হাঁটুতে ডান পায়ের গোড়ালি রেখে ঝুঁকে, রমনী রাতের শরীরে এখন বুঝি সর্বস্ব মেলার, দেবার কাঁপুনি। একটা তির তির্ আলো কেঁপে বেড়াচ্ছে। দূরে মাল বোঝাই লরী, মানুষ বোঝাই বাস আসছে। চলে যাচ্ছে, 'মন দিলে তো মন মিলেরে' মাতালটার গলা ছড়িয়ে যাচ্ছে, চারদিকে। লোকটা চালু পুরিয়া। আশেপাশে জানান দিচ্ছে, আমি মাতাল, আমাকে দেখ। মানে লোকে বলুক—আহারে লোকটার কি জ্বালা। আহাম্মক। নবেন্দু পেছন ফিরে তাকায়। ঘরের দরজা তেমি ভেজানো। ভারী পায়ে রাস্তায় নেমে যায় সে। নিজমনে হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই মিনু।—আমি ভালবাসার অর্থ বুঝি না মিনু। কেউ কি বোঝে ? কথার চমক নাকি ভেতরের যন্ত্রণা ? কোন্‌টা ভালবাসার কষ্টিপাথর ?

প্রথম পরিচয় তপতীর বাড়ীতে। এটা সেটার পর শান্তা ভূমিকাহীন বলে বসেছিল—ছেলেদের আমি বিশ্বাস করি না।—কেন ? কোথাও আঘাত খেয়েছেন বুঝি ? নবেন্দুর বাঁকা প্রশ্ন।—আঘাত ? ম্লান হেসে শান্তা বলেছিল, আঘাতের ব্যাপার নয়। ওদের ভেতরের বিষ চোখের পারদে টলটল করে।—সব পুরুষেরই ?—নিশ্চয়ই, কিছু কম বেশী।—আমার চোখে কতটা আছে বলুনতো। সঙ্গে সঙ্গে দুটো দুটো চারটে চোখ। পরস্পর খেলছিল, হাসছিলো, নাচছিলো, ছটোপাটি লুটোপুটি করে পরস্পরকে কামড়ে ধরছিল। এবং সেই মরণ কামড়। নবেন্দুর নিঃশ্বাস পড়ছিল ঘন ঘন। শান্তার চোখ বুঁজে আসছিলো ঘন ঘন। নবেন্দুর শরীরে বিদ্যুৎ। শান্তার শরীরে বিদ্যুৎ। নবেন্দুর বুকে মোচড়। শান্তার ভেতরে তোল পাড়। নবেন্দু, শান্তা। শান্তা, নবেন্দু।

এই মহলে রটে যায়। ওই মহলে কানাকানি। এবং অবশেষে তৃতীয় ব্যক্তির রাজকীয় গলা—কনগ্রাচুলেশন মিঃ ব্যানার্জী, কন্‌গ্রাচুলেশন মিসেস ব্যানার্জী।

পাশে একটা মেলাখোলা মাঠ। কয়েকজন লোক ঘন হয়ে বসে আছে। অবাঙালী বোধ হয়। ওদের হাতে হাতে কি যেন ঘুরছে। মাঝে মাঝে আগুনের ফুল্‌কি, শূন্যে উড়ে ধোঁয়ায় মুখগুলো অস্পষ্ট, ঢেকে যাচ্ছে। নবেন্দু তাদের দেখতে থাকে। কেমন মশগুল ওরা। নবেন্দুকে দেখেও দেখে না। ভাবনা চিন্তাহীন্ সাধাসিধে জীবন, যেন কোন ভড়ং নেই, দায়-দায়িত্বও। ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে—এখন লোকজন কম, মাঝে মধ্যে দু'একজন জোর পায়ে আসছে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্ন গাছ গুলোর ছায়া ছোট হয়ে এখন যার যার পায়ের গোড়ায়। পোয়াতি মেয়েদের মতো রাতটা যেন ক্লান্তিতে ঝিমোচ্ছে। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে নবেন্দু। সামনেরটা মিহুর বাড়ী। চৌদ্দর শাতাশ দরজায় লেখা। এখানে কি করতে এলি নবেন্দু—নিজেকেই প্রশ্ন। কান্নাকাটি করতে? নাকি বলার জায়গা না পেয়ে? ফিরবো না ফিরবো না করেও বেহায়া কুকুরের মতো মুখ ঘোরায় নবেন্দু। পা টেনে টেনে আবার সেই মাঠের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সেখানে এখন ঝিম ঝিম সুখ। উদার জীবগুলোর ছেঁড়া বেঁড়া কথাবার্তা ও বেহিসেবী আমেজ। ওদের পাশে এসে বসে পড়ে। অসংলগ্ন শুনতে শুনতে এক সময় সটান শুয়ে, মুখের উপর আকাশ, বুটিদার শাড়ী। শাড়ী নয়, ধূসর মেঘ। পাহাড় পাহাড় মেঘ। আকাশে মেঘের খেলা। তুলো তুলো মেঘের ছুটোছুটি। মেঘের ওড়না গায়ে রাঙ্গাদি, হাসছে। পেছনে নবু, ছুঁতে গিয়ে ছুঁতে পারে না। রাঙ্গাদি হাসে, টিট্‌কারী দেয়—হেরো, হেরো।

রাতজাগা চোখে তাকিয়ে থাকে শান্তা, দূরের রাস্তায়। রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠ। মাঠ পেরিয়ে সবুজ গাছ গাছালি, তারপর ঝুলে পড়া আকাশ। সব যেন মিলে মিশে একাকার। শান্তা নির্নিমেষ তাকিয়ে, কপালে সুতো সুতো শিরা, ফুলে আছে। উদাস দৃষ্টির তলায় কেমন যেন কালচে আঁধার। চোখে মুখে অস্থিরতা। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে টান টান দাঁড়িয়ে থাকে সে। যেন বা আগুনে রাগ পাহাড়া দেওয়া। নীচে বালির ঢিবিতে খেলা করছে বাচ্চা কাচ্চারা। ঘর ঘর খেলা। মাস্ত ঘর বানাচ্ছে। টোটন ভেঙ্গে দিচ্ছে। মাস্ত চীৎকার করছে। টোটন খল খল হাসছে। ওদের চোখে মুখে শীতের রোদ

লাফিয়ে লাফিয়ে শান্তা সব দেখে, কিন্তু কিছুই চোখে ধরে না। চোখটা যে বুকের ভেতরে। স্মৃতির অতল সাগরে। ডুবে ডুবে ডুবে ডুবে। ভাবতেও অবাক লাগে। নবেন্দুর মিষ্টি দুষ্টু হাসি, চনমনে কথাবার্তা, গোঁ ধরা স্বভাব, কিভাবে তাকে হারিয়ে দিয়েছিল। শান্তা হেরে গিয়েছিল। অথচ চন্দন, যার থোসামোদে কথা, মনরাখা হাংলামি বা বোকাচালাক হাসি, তাকে টলাতে পারেনি। নবেন্দুর ভেতরে ভয়ংকর পৌরুষ, আর চন্দনের ভেতর যেন এক ভীতু নারীমন। সেদিন শান্তার উড়নচণ্ডী ভেতরটা ভয়ংকর ঝড়ে টুকরো টুকরো হত উড়ে গিয়ে ওলটপালট খাওয়া, বা দোল্ দোল্ দোলা যেমন।

খিল খিল হাসিতে শান্তার শরীর দুলছিল, মন ও। রেষ্টুরেন্টের কাঁচে চোখ ভাসিয়ে রেখে বলেছিলো—ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার ভারী মজা। নবেন্দু ঠোঁটের ডগায় সিগ্রেট ধরে রেখে, নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলেছিল—বাজে কথা। মেয়েদের বোহেমিয়ান এ্যাটিচুড্ থাকে না। থাকলেও লিমিটেড্।—ছেলেরা বুঝি লিমিটলেস? শান্তার হাসিতে রোদ। অপলকে তাকিয়ে থেকে নবেন্দু বলেছিল—তাদেরও লিমিট আছে, তবে মেয়েদের মতো না।—কটা মেয়ে দেখেছেন আপনি? শান্তার গলায় চ্যালেঞ্জ।—এই পর্যন্ত দু'টো, শান্তা আর তপতী, নবেন্দুর মিটির মিটির ঠোঁটে দুষ্টুমি খেলা করছিল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তার গম্ভীর গম্ভীর্য। স্থির স্বরে বলেছিল—আমি না তপতী, কাকে আপনার বেশী পছন্দ?—তপতীর ক্লান্ত বিষন্ন চোখ আর তোমার চনমনে মন দুটোই লোভনীয়, আরো গম্ভীর শান্তা। শরীরে বেপরোয়া ঢেউ তুলে বলেছিল—পুরুষদের এই টেণ্ডেন্সিটাকে বোহেমিয়ান নয়, পার্ভার্টেড্ বলে। রাগ দেখিয়ে জানালায় ছুটে গেলে নবেন্দু হঠাৎ হো-হো, হো-হা হেসে, যেন তালে তালে পায়রা ওড়ানো, অসহ্য আবেগে কেঁদে ফেলেছিল শান্তা। কান্না নয় তা যেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পন।

স্মৃতির ঘষা কাঁচে এখন আর ছায়া পড়ে না। কিছু স্মৃতি, কিছু বিস্মৃতি শান্তাকে তোলপাড় করে, কষ্ট দেয়। নবেন্দু মুখোশ পরেছিল। সরলতার আড়ালে একটা কুট হিপোক্রীট। প্রেম-প্রীতি ভালবাসার পেছনে শোষণ তৃষ্ণার লালসা। আগ্রাসোড়াই একটা ভনিতা। অথচ লুকিয়ে চুরিয়ে মিনু, রাজাদির খোঁজ খবর রাখে। আর শান্তার সামনে নবেন্দু বোকা সন্ন্যাসী। টানা নিঃশ্বাস ফেলে শান্তা। বুকে চাপ চাপ ব্যথা। দু'চোখে আগুন লকলকে। জ্বালা জ্বালা যন্ত্রনা। রাতে ঘুম হয় নি তার। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসে,

চোখ বুঁজে যায়। কিন্তু অসহ্য উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ কাঁপে। ঘুম আসবে না।—এই ভাবে আর চলতে পারে না। একটা হেস্তনেস্ত চাই। ঘর ভাঙ্গার ইচ্ছে তো ঘর বানিয়েছিল কেন নবেন্দু? একি খেলার ঘর? নাকি যাকে বলে যৌবনের কুড়কুড়ি, সাময়িক ঝোঁক? বিমনা হয়ে যায় শান্তা, আত্মলীন। চন্দনটা আজকাল বড় বেশী পোষাকী। ব্যবহারও জটিল হয়ে উঠছে। সে যেন আরো গভীর কিছু বোঝাতে শান্তা বোঝে, বোঝে না। দু'চোখে মমতা মেখে সে জিজ্ঞেস করে—তোমার কি হয়েছে বলতো চন্দন?—কেন?—আজকাল যেন দায়সারা কথাবার্তা বলছো। করুণ হেসে চন্দন বলে—এইসব কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে।—কোন্ সব?—এই অর্থহীন ঘোরাঘুরি।—সব বুড়িয়ে যাচ্ছে তাই না?—তোমারই কী ভাল লাগছে? চন্দনের স্বরে বিরক্তি, অস্থিরতা। চোখের কোণায় বুঝি গভীর অর্থ, জিভের ডগায় লোভ। শান্তা মুখ ফিরিয়ে নেয়। সব হারিয়েও শান্তা অন্ততঃ কিছু রাখতে চেয়েছিল। প্রেম-প্রীতি ভালবাসার কাঙাল মনটাকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে কোন ভাবে বেঁচে কিন্তু পারলো কই? চন্দন তো দিতে জানে না, এমন কি পেতেও না। সেই মন, দরদ বা সাহস চন্দনের মধ্যে কোথায়?

নড়ে চড়ে দাঁড়ায় সে, পায়ের গোছায় পা রেখে। বড় পলকা মনে হয়, যেন নড়বড়ে শরীর। ঝড় বিধ্বস্ত গাছের মতো ডালপালা ভাঙ্গা। হাতে পায়ে কোন জোর পায় না। উদাস অবশ দৃষ্টি। হঠাৎ দু'চোখে হু হু জল—আমি হেরে গেলাম হেরে গেলাম, ঘোরতর পরাজয়। এক ভুল শোধরাতে গিয়ে আমি কি আরেক ভুল করে চলেছি? শান্তার ঠোঁট কাঁপে। মাথা ঝিম ঝিম। দু'চোখে জ্বালা। বুকের মধ্যে কে যেন কুড়ুল মারে। একটা কষ্টকর যন্ত্রণা গলা বুক বেয়ে পাক খেতে থাকে। এই সব ভুলে যেতে সে রাস্তায় চোখ ফেলে, ভোরের রোদ্দ চকমক করে চারদিকে। লোকজনের যাতায়াতের ভেতর ব্যস্ততা। যে যার কাজে যাচ্ছে। ফিরে আসছে। নীচে মাঠ টোটনরা বালির ঢিবিতে খেলছে। ঘর ঘর খেলা। হৈ চৈ চীৎকারে মাঝে মাঝে শান্তার ভাবনার সুতো ছিঁড়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। তবু জোর করে সে চোখ খোলা রাখে। এক বানর-নাচিয়ে দু'টো বানর নিয়ে রাস্তায় খেলা দেখাচ্ছে। একটা মেয়ে বাঁদর, আরেকটা পুরুষ—বিয়ে করবি সাহেব, বিয়ে করবি? বাঁদরটা হ্যাঁ-হ্যাঁ মাথা নাড়ে—তুই কি বলিস বিবি? তুই? মেয়ে বাঁদরটা ঝিম মেরে বসে থাকে।—করবি না, বিয়ে করবি না? ও না—না মাথা নাড়ে। একা

থাকতে পারবি তো—পারবো ? পারবো ভঙ্গি করে মেয়ে বাবরটা ঘুরে গিয়ে লোকজন ভড়ো হয়ে চাষিক ঘিরে ফেলে। আর কিছুই দেখতে পায় না সে। অনুতাপের একটা জ্বালা রি রি করে শান্তার গলা বুক বেয়ে নীচে নামতে নামতে —অসহ্য যন্ত্রণা যেন। মাথা ঘুরে যায়। জোর করে রেলিঙে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ মেলে রাখে নীচে। মাস্ত চীৎকার করে চলেছে—ভাঙলি কেন ? আমার ঘর ভাঙলি কেন ? টেটিয়ার ভঙ্গিতে টোটন হাসে। মাস্ত কাঁদে। হঠাৎ শান্তা রাস্তার মোড়ে নবেন্দুকে দেখতে পায়। উস্কো-চেহারা, পাণ্ডুর মুখ। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে নবেন্দু। শান্তা ভেতরে ভেতরে ছটফট করে। আর যেন সহ্য হয় না। সে অস্থির আক্রোশে নীচে তাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে বুক ফাটিয়ে 'ঘর ভাঙবি না টোটন' বলতে যায়। কিন্তু শুধু 'টোটন' শব্দটা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। ওপরে তাকায় টোটন। থমকে দাঁড়ায় নবেন্দু।

With Best Compliments from :

Bhangar Service Station

I. B. P. Petrol Dealers

P. O. Bhangar
24-Parganas

নক্ষত্র

অমূল্যকুমার চক্রবর্তী

ল্যাবরেটরির ম্যাসবার্গার এসিড টেস্টটিউব নানা বিচিত্র সাজসরঞ্জাম দারুণ ব্যস্ত রাখে পুষ্করকে, কারণ এই রহস্যের জগতে যখন সে সৃষ্টি সাধনায় সম্পূর্ণ নিমগ্ন তখন বাইরের চলমান পৃথিবী ও সংসার যেন অলীক, অবর্তমান। বিকাশের সঙ্গে মতান্তর হয় এই নিয়ে, এত কি? সঞ্জীবন কার্যের ব্যবস্থা বাড়ানোর জন্য নাওয়াখাওয়া ভুলে ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকার চরম বোকামী পুষ্করের যদি হয় ত হোক, কিন্তু তার কোনোদিন হবেনা, একথাটা বিকাশ বারবার জানিয়ে দিয়েছে। সহকর্মীকে একা ফেলে রেখে, কাজের ক্ষতি হবে জেনেও, চলে গেছে খেলার মাঠে বা সিনেমায় বা থিয়েটারে। বর্ণা সঙ্গী হয় মাঝে মাঝে। পুষ্করের সঙ্গে প্রোগ্রাম করে টিকেট কেটে এনে যখন মুখা হয়েছে অপেক্ষা, অনুনয় অনুরোধ, রাস দেখাবার জন্যেই তখন বিকাশকে ডেকেছে প্লেবের টিকেট দেখিয়ে বা শম্ভু মিত্রের কোনো নাটকের জন্য এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্-এ।

—কি পাও তুমি এর মধ্যে পুষ্কর? বর্ণা একদিন বিদ্রোহ করল অসহনীয় রাগের মাথায়, বিকাশ চলে গেছে মোহনবাগানের খেলা দেখতে।

—কৌতূহল, আবিষ্কারের আনন্দ। আর কি? বলে তার উজ্জ্বল দু'চোখ তুলে পুষ্কর তাকিয়ে থাকে বর্ণার মুখের দিকে।

—কৌতূহল আছে তোমার? আমার জন্য হয় না?

—তুমি? বর্ণা? তুমি ত অলরাডি উপস্থিত 'আবিষ্কার করার কি আছে? কিন্তু এখানে এই জারের মধ্যে তাকত···'

—রাখো তোমার জার, তুমি আমাকে আবিষ্কার করতে পেরেছ? ল্যাবরেটরির কেমিক্যাল এমন রহস্যময়, মানুষ নয়, ইউসলেস্, তুমি পুষ্কর। তোমার মন গেল কোথায়?

—মন হেঁটে চলে স্বপ্নের জগতে।

—কবিদের হয়, তুমি বিজ্ঞানী, বস্তু নিয়েই কারবার তোমার।

—স্বপ্ন দেখা, স্বপ্নকে মূর্তিময় করে তোলা এই আমার কাজ বর্ণা। মানুষের সবই প্রিডিটারমাইন্ড, পূর্বনির্ধারিত যা ঘটছে যা ঘটবে জীবনে।

—আমার তোমার বিকাশের জয়নাথের ডিরেক্টর ভাওয়ারীর, সবারই প্রিডিটারমাইন্ড্ ?

—সবারই। আকাশের তারা দেখেছ গভীর অন্ধকার রাত্রিতে ?

—ঘুম না এলে জানালায় তাকালেই ত দেখা যায়।

—জীবনের সব রহস্যই জানতে পার নক্ষত্র দেখে।

—তুমি দেখো পুষ্কর রাত্রির তারায় আমার জীবনে এক রহস্য লুকিয়ে আছে।

—দেখা হয়ে গেছে।

—সত্যি ? বল তাহলে, তোমার সঙ্গে আমার যোগ না বিয়োগ ?

—বিরহ নয়, মিলনও নয়।

—কচু দেখেছ। সব বোগাস।

—কি তবে ? মেণ্টাল ফিসিক্যাল—

—মিলন। রীতিমত মেণ্টাল ফিসিক্যাল কেমিক্যাল মিলন। বলে তির্যক দৃষ্টিতে পুষ্করকে নিরুত্তর ক'রে রেখে বর্ণা খস্ মস্ শব্দে বেরিয়ে চলে গেল।

রাত্রির খাওয়া শেষ হয় দশটার পর : এগারোটা পর্যন্ত চলে কোনো কোনোদিন, তখন পুবদিকের বারান্দায় ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে পুষ্কর সরকার, নক্ষত্র দেখে, কৃষ্ণপক্ষেই সুবিধা, শুক্লপক্ষের প্রথমভাগেও বেশী অসুবিধে নেই। আকাশে তারার যাতায়াতের পথ এই বারান্দায় দাঁড়িয়েই চেনা লাগে। কোনো খেয়াল থাকে না কেমন করে সময় কেটে যায়। দূরে সঞ্জীবন কারখানায় বারোটার ঘণ্টা পেটা হয়, শব্দের ঢেউগুলো কানে বাজলে হুঁস হয়।

নেশা নয়, পেশাও নয়, পুষ্করের রাত্রিতে কালো আকাশের গায়ে তারা দেখা পুষ্করের নূতন অনুভূতি, নূতন জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন ও উত্তর। মানুষের জীবনের যত গভীর রহস্য তার মধ্যে ডুবে যাওয়া এবং কখনো কিছু খুঁজে পাওয়া। আকাশের নক্ষত্রে কি কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকে ? কে জানে। পুষ্কর নিজে ও জানে না, কিন্তু কিছু একটা হয়, নক্ষত্রের অবস্থান, গতিপথ, রাশিচক্রে স্থিতি ও প্রস্থান এসব জটিল হিসাব কষতে কষতে কখন কি সূত্রে হঠাৎ একটা উপলব্ধির মত ঘটে যায়। তখন পুষ্কর স্বচ্ছ দেখতে পায় অমুকের জীবনে কি ঘটছে কি ঘটতে চলছে। পুষ্কর শিউরে ওঠে যখন একদিন চোখের সামনে ঘটতে দেখে যে ঘটনার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা ওর জানা ছিল, এবং তখন হঠাৎ অরুচি ধরে, এই নক্ষত্র গণনার কাজটাই বোগাস্ অমূলক বিভ্রান্তিকর মনে করতে থাকে।

তখন কয়েকদিন পুষ্কর মুগ্ধ হয়ে দেখে ছায়াপথে বিচিত্র নক্ষত্র সম্মেলন, তারায় ভরা আকাশের অতল সৌন্দর্যের গভীরে ডুবে যেতে থাকে এবং এক অনির্বচনীয় প্রশান্ত অনুভূতির স্বাদে তৃপ্তি পায়।

অফিস কারখানা ল্যাবরেটরিতে দারুণ হৈ চৈ পড়ে গেছে, কারো জানতে বাকী নেই টাকা ভেঙে পালিয়েছে জয়নাথ মিত্র, সেলস ডিভিসনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়েছে। কেমিক্যাল শিল্প কারখানা সঞ্জীবন-এর ক্যাশ খসিয়ে নিয়ে গেছে সে, নক্ষত্রের অন্তর্ধানে গভীরতর অন্ধকার চেপে বসেছে। কিন্তু তার বুক চিরে ফ্ল্যাশ-এর জ্বালা।

ল্যাবরেটরিতে খবরটা এসে পৌঁছল দুপুরের পর, কেমিস্ট্ বিকাশ রায় এসে ঢুকল পুষ্কর সরকারের ঘরে। পুষ্কর গবেষণা করে এখানে প্রস্তুতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি বিষয়ে, নূতন সূত্র আবিষ্কার করে, স্যাম্পল তৈরী ক'রে প্রডাক্‌শন ডিভিসানে পাঠায়।

—শুনলে ত পুষ্কর, জয়নাথ হেভি হাতে মেরে উধাও? বিকাশের চাপা বিস্ময় ও উত্তেজনা প্রশ্নেই পরিস্ফুট।

কাঁচের বয়াম সরিয়ে রেখে পুষ্কর বলল, এত শিগ্‌গীর ঘটবে ভাবিনি, তবে সম্ভাবনা জানতাম।

—জানতে?

একটা দুর্ঘটনা আসন্ন তা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু সময়ের পরিমাপ ঠিক হয় নি আমার।

—ল্যাবরেটরিতে বসে ওষুধের গবেষণা হচ্ছে না কি সঞ্জীবন কার্যের চুরি ডাকাতি দুর্ঘটনার গবেষণা চালাচ্ছ, পুষ্কর? বাজারে কোম্পানীর পাওনা টাকা আদায় করে নিয়ে পালাল সেলস্ ম্যানেজার, এত বড় লোকসান, আর তুমি বলছ আগেই জানতে পেরেছিলে! জানাও নি কেন?

—ডিরেক্টর ভাণ্ডারী সাহেবকে গত সপ্তাহে বলেছিলাম একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারিনি তাই গুরুত্বও দেন নি তিনি। তাই স্বাভাবিক।

—কার্যকারণ না দেখালে কে গুরুত্ব দেবে তোমার হেঁয়ালিতে?

—একশবার। ল্যাবরেটরিতে আমি মানব কখনো কার্যকারণবিহীন, যুক্তিতথ্যহীন কোনো কথা? কিন্তু মানুষের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে আরো অনেক কিছু আছে যা কিনা অঙ্কের ধরাছোঁয়ার বাইরে, বুঝলে বিকাশদা?

—পরে একসময় বসে শুনব, বড় মজার কথা বলছ পুষ্কর, বুঝিয়ে দিও ত ভাল করে। বলে বিকাশ বেরিয়ে চলে গেল নিজের কাজের টেবিলে, কেমন রহস্যময় হয়ে থাকল ব্যাপারটা, একটা জটপাকানো ভাব। অশুভ ঘটনার ছায়াপাত আগেই ঘটে প্রবাদ—এ কে না জানে? পুষ্করের হেঁয়ালিটা আরো পরিষ্কার বোঝা দরকার, ফিরে এল কিন্তু পুষ্করের সঙ্গে দেখা হল না, ঘরে নেই; ডিরেক্টর ভাণ্ডারী, ডেকে পাঠিয়েছেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মাঝপথে বর্ণাকে দেখে পুষ্কর অবাক হ'ল, রিসেপশন টেবিলের প্রাণোচ্ছল সুন্দরী অপরূপ আকর্ষণ তার, আজ করুণ মুখ-চোখ। সহানুভূতি বোধ করে, কিন্তু কিছু না বলাই ভাল মনে করে পুষ্কর। তাছাড়া ভাণ্ডারীর সঙ্গে এতক্ষণ যে ধরণের কথাবার্তা হয়েছে তার ঝাঁঝটা কাটাচ্ছিল। সিঁড়ির একই ধাপে পৌঁছে বর্ণা নিজেই বলল, পুষ্কর, তোমার সঙ্গে দরকারী কটা কথা আছে, একটু সময় হবে?

—ল্যাবরেটরীতে জরুরী কাজ আছে।

—ও, তাই বুঝি? তবে থাক। বলে মুখ তুলে তাকাল বর্ণা, স্বর নামিয়ে আবার বলল, আগে তোমার এত সময়ের অভাব হয়নি পুষ্কর, ল্যাবরেটারীতে কাজ তখনো থাকত, মনে পড়ে?

—তা ভেবে আর কি লাভ, বর্ণা?

—তোমার লাভ নেই, আমারও দাবী নেই। তবে আমার জরুরী কথা এখন তোমাকেই শুধু বলতে পারি, যদি কখনো সময় দিতে পারো ত ডেকো। খট্‌খট্‌ শব্দে বর্ণা নামছিল ওপর থেকে বাকী সিঁড়িগুলোতে আর পায়ের শব্দ হল না।

—ডিরেক্টরের সঙ্গে কথাবার্তার পর—ল্যাবরেটরীতে ফিরে এসে পুষ্কর কাজে মন দিতে পারছেনা। বিকাশ আবার খুঁজতে এসে পুষ্করকে গম্ভীর দেখে জিজ্ঞেস করল, ডিরেক্টরের এত ডাকাডাকি কিজন্য?

নূতন স্যাম্পলগুলো চাই, দেরি হচ্ছে কেন?

—জয়নাথ সম্পর্কে কোনো কথা নয়?

—না। নূতন প্রোডাক্ট মার্কেটে ছেড়ে ফার্মকে নূতন ডায়মেনসনে দাঁড় করাতে হবে, সুতরাং স্যাম্পল-এর জন্য জোর তাগাদা।

—স্যাম্পল্ করেই তোমার জীবনটা যাবে দেখছি।

—কেন? পরে কিছু নেই?

—প্রডাক্‌শান।

—হ্যাঁ, প্রডাক্‌শন। জানো বিকাশদা, জয়নাথেরই জয়।

—ধোঁকা দেবেনা, আমিও ল্যাবরেটরি-ম্যান, হিসেবমত কথা আর মানে। হিসেবের বাইরেই যে বেশী কথা, বেশী ঘটনা। তোমাকে পরে বুঝিয়েবলব।

—বেশ। আমি জানতে চাই। পুষ্কর, আমার হঠাৎ কেমন মনে হচ্ছে সঞ্জীবন কার্মটা উঠে যাবে।

—উঠে যাবে? ল্যাবরেটরিতে বসে তুমি আর আমি নূতন ফরমূলায় নূতন স্যাম্‌পল করব। সঞ্জীবনকে দেওয়া হবে নূতন ডায়মেনশন্। এই ত কথা! উঠে যাবে কেন?

—হঠাৎ থেকে থেকে আমার মনে হচ্ছে।

—বিচিত্র কি? উঠেও যেতে পারে।

কারখানার লোকগুলোর কি হবে? অফিস্, সেল্‌স্—কত লোক কোথায় যাবে সবাই!

—যোগ্যতা থাকে ত তারাই উঠে পড়ে লাগবে, কার্ম চালাবে, আবার স্যাম্পল, আবার প্রডাকশন, আবার নাম, আবার হয়ত একদিন আর এক জয়নাথ।

চুপ করে শুনছিল বিকাশ, বলল,—তুমি এক ওয়ার্থলেস্, পুষ্কর। এত এ্যাডভান্স কেউ ভাবে?

—ভাবনা আমার দৌড়ে যায়।

—বিজ্ঞানীর, কি এটা চলে?

—খাঁটি স্বপ্ন আর কে দেখাতে পারে, বিজ্ঞানী ছাড়া? আর, স্বপ্ন না হলে চিন্তা দৌড়াবে কেন?

—তা হবে। তুমি কি বলছিলে, শেষ পর্যন্ত জয়নাথেরই জয়? পরিষ্কার বুঝিয়ে বলবে? নিষুপ্তির গভীর রাত্রির তারাখচিত আকাশে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে সন্দেহ হয় সময়ের আয়ু আছে কি? কালহীন সীমাহীন সময়-সমুদ্রে ঢেউএর ওঠা পড়া, বুদ্‌বুদেরও হাসি অন্তর্ধান। নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, জল বাতাস আকাশ মাটি মানুষ—অনন্ত লীলাখেলা। আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত চড়ানো ছায়া পথে কেউ হেঁটে হেঁটে চলেছেন কি হাতে পতাকা উড়িয়ে সঙ্কেত জানিয়ে দিয়ে—সব ঠিক আছে। চল, তোমরা এগিয়ে চল কুয়াশা ঢাকা ভবিষ্যতের পর্দা সরিয়ে ফেলে। সব ঠিক আছে, এগিয়ে চল।

দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে পড়ে পুষ্কর। আজো চোখে ঘুম নেই, আকাশে কালপুরুষ যেন মূর্তিমান প্রহরী, উত্তরে রেখা টেনে জ্যামিতিক কোণের হিসেব মিলিয়ে রাত্রি দুটোর পর চন্দনবর্ণ নক্ষত্রটা কি একা? তার পাশে দেখা যায় কি অপরাজিতা রং ছট্‌ফটে মিটি মিটি ছোট সেই তারা? এটা দেখার জন্যই রাত জেগে বারান্দায় পায়চারি করছে পুষ্কর। অন্য কোনো নক্ষত্রের ছায়াপাতে সেই নীল তারা দেখা না যাবার সম্ভাবনাও থাকে, এখনো পুষ্কর নিশ্চিত হ'তে পারে নি দিকচিহ্নহীন অসীম ব্রহ্মাণ্ডের কোন সৌর-জগতের রহস্যময় নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আলো অন্ধকারের খেলা চলছে এবং অদৃশ্য বিশেষ কোন নক্ষত্রের প্রভাবে দৃশ্যমান তারার অবলুপ্তি ঘটে অচিন্ত্যনীয় ভাবে, কার্যকারণহীনভাবে, যুক্তি সিদ্ধান্তের বাইরে। কিন্তু, কার্য হয় কি ক'রে কারণ ছাড়া? দৃষ্টির আড়ালে কারণ বর্তমান, প্রতিক্রিয়াটা শুধু দৃশ্যমান। পুষ্কর সাধ্যমত দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে দেখে, প্রাণপণ চেষ্টায় দেখে। আজ শুধু চন্দনবর্ণ নক্ষত্র একা জ্বল জ্বল করছে কালপুরুষের শিরবিন্দু থেকে প্রলম্বিত উত্তরাভিমুখী দীর্ঘ রেখাটি যেখানে উত্তরপশ্চিম আকাশ দিগন্তে ঝুলে পড়েছে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে পুষ্কর। তাকিয়েই থাকে। নক্ষত্র নিথর। নক্ষত্র জ্বল জ্বল করে। পুষ্কর কেঁপে ওঠে। গভীর রাত্রির তারাভরা উত্তরপশ্চিম আকাশ-দিগন্তে এ যেন আরেক পুষ্করের মুখ, কি বলতে চায়, বলতে পারে না।

—খুব ব্যস্ত নাকি? আসব। বলতে বলতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছে বর্ণা তাকিয়ে দেখল পুষ্কর, জিজ্ঞেস করল—এস। কি খবর?

—তুমি ডেকে পাঠালে তাই এলাম। ল্যাবরেটরি ঘরে পুষ্করের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল বর্ণা।

—আজ সময় দিতে পারি তাই ভাবলাম, সেদিন কি বলতে চেয়েছিলে তুমি।

ল্যাবরেটরির পোষাকে পুষ্করকে যেন ভিন্ন জগতের পুরুষ মনে হয়। দস্তানা পরা দু'হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলাটাও বিচিত্র নয়, কারণ অসাধারণ মানুষের কোড্‌ অব্‌ কণ্ডাক্ট্‌ স্বাভাবিকতার স্তরে বিচার করা চলে না এ রকম একটা চিন্তায় বর্ণা অভ্যস্ত অনেকদিন থেকে। আজ সেই অভ্যস্ত চিন্তায় স্বস্তি পাচ্ছে না বর্ণা, অস্বস্তির উস্‌খুস্‌ ভাব পেছন ধ'রে টানে।

—পুষ্কর।

—বল।

—তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে আমার।

—বল। আজ হাতে সময় আছে আমার।

—সম্পূর্ণ শুনতে হবে।

—শুনব।

—শুনে তুমি যদি শক্ত পাথর হয়ে যাও?

—আমার মনের খবর তুমি জান।

—শুনে তোমাকে গলে জলও হতে হবে আমার জন্য।

শেষ পরিণতি?

—পরিণতি? বর্ণার অমোঘ দু চোখের দৃষ্টি পুষ্করের মুখের ওপর। জিজ্ঞাসার প্রশ্ন রেখে নিজেই বলল,—পরিণতির খবর আমি বলতে পারি না, পুষ্কর। পরিণতি নিশ্চয় আছে। সব কিছুই ত প্রি-ডিটারমাইন্ড্, তোমার মতে, তাই না?

—জরুরী কথা পরে হবে। আমার প্রশ্নের জবাব দাও যদি বাধা না থাকে।

—প্রশ্ন করবে? কর্। শক্ত পাথর বানিয়ে দিয়ো না আমাকে, পুষ্কর।

—বেশ। সোজা প্রশ্ন। ডিরেক্টর ভাণ্ডারীর সঙ্গে কতটা মিশেছে? তুমি শুধু তার সেক্রেটারি নও, টান্ আরো গভীরে।

—মিশেছি, মিথ্যে নয়। কি জানতে চাও।

—এই সঞ্জীবন ফার্ম কি উঠে যাবে?

—কেন মনে হ'ল এ কথা?

—বিকাশদার প্রশ্ন।

—মনে হয় না, সে রকম।

ক্রিং ক্রিং তখনি টেলিফোনটা বেজে ওঠে, পুষ্কর রিসিভার তুলে কথা সুরু করে দেয়: হ্যালো বিকাশদা? বল। কোথায়? ভাণ্ডারী? কেন ডাকছেন? হ্যালো বিকাশদা, থাক, এখন আমি যাব না, কাজ ছেড়ে এখন উঠতে পারছি না, তুমিই কথা বল, পরে ডিটেল্স্ শুনব, তবে, সঞ্জীবন ফার্ম চলবে কি বন্ধ হবে সেটা ভাণ্ডারীর খেয়াল খুশীর ব্যাপার নয় এটা তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো ত ভাল। বলে ঠকাস্ করে ফোনের রিসিভার ফেলে রাখল পুষ্কর।

বর্ণা শুনছিল, চিন্তা না করেই বলল,—তুমি কিস্সু বোঝ না! তুমি যে সোজা প্রশ্ন করছিলে আমাকে, তার জবাব পেলে?

—হেঁয়ালি করো না। স্পষ্ট করে বল। তোমরা সবাই কিছু প্যাঁচ কষছ?

ওদিকে জয়নাথ ত প্রায় ডুবিয়েই দিয়ে গেল।

—তাহলে সোজা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। শোনো, সঞ্জীবন ফার্মে তালা পড়বে সে ব্যবস্থা হচ্ছে গোপনে ভাওয়ালী নূতন নামে ফার্ম খুলবেন, বিকাশদাও যোগ দেবেন তার ফর্মুলাগুলো নিয়ে। ব্যাঙ্কের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে।

—বিকাশদা? বল কি, বিকাশদাও?

—ফোনে কি শুনলে তবে?

—এখন পরিষ্কার হচ্ছে, সঞ্জীবন ফার্ম ক্লোজার হবে? এই ল্যাবরেটরি? আমরা?

—তোমার খুব চিন্তা হচ্ছে, পুষ্কর?

—বুঝতে পাচ্ছি না ঠিক।

—আমার কথা শোন তবে।

—শুনব। তুমি বসবে একটু, বর্ণা? হাতমুখ ধুয়ে আসি।

—চট্ করে। এখানে ভাল লাগছে না। দুটো টিকেট কেটে রেখেছি, এ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টস্ হলে চলো যাই, পুষ্কর।

—আপত্তি নেই।

ট্যাক্সি বিড়লা প্ল্যানেটারিয়মের মোড় ঘুরে যাবার আগেই পুষ্কর বলল,—এ্যাকাডেমির বন্ধ হলের মধ্যে গিয়ে বসার কি দরকার, বর্ণা, তার চেয়ে চল ময়দানে সবুজ ঘাসের মখমলে গিয়েই বসি।

—রিয়ালি নাইস্! তুমি হঠাৎ হঠাৎ আগেকার পুষ্কর হয়ে উঠতে পারো তবে দুঃখ, টিকেট দুটো নষ্ট হবে, তা হোক্।

দুজনে পাশাপাশি হেঁটে চলল ময়দানের বিস্তৃত অঙ্গনে ঠাঁই খুঁজে নিতে। পুষ্কর বলে উঠল,—তার চেয়ে চল এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিরিবিলি কোণে বসি দু'জনে।

চিরদিনের সরগরম সেই রাস্তাটা ওদের দুজনকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল ফটকের সামনে, ভিড় ঠেলে ঠেলে যাওয়ার এক অপূর্ব সুখে কোনো ক্লান্তিবোধ জাগেনা ওদের মনে, ওরা বেলুনওয়ালার হাত থেকে রংবাহার বেলুন কিনে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিল আদর ক'রে, ফুচকাওয়ালার পাশে দাঁড়িয়ে শালপাতার পাত্রে অবিশ্বাস্য তৃপ্তিতে খেলো তেঁতুল জল ভোবানো আলুসেদ্ধ ভরা ঐ দারুণ খাদ্য, পুষ্কর কিনল পকেট বোঝাই চিনেবাদাম। বর্ণার লোভ আইসক্রীমে, তাই হ'ল। দুজনে এগিয়ে গেল মহিমময়ী ভিক্টোরিয়ার

মূর্তি পাশে রেখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ পার হয়ে শুভ্র প্রশান্ত সিঁড়ির সম্মুখ দিয়ে হেঁটে হেঁটে পশ্চিমধারে বৃক্ষছায়া স্নিগ্ধ রহস্যময় সেই বাগিচায়। হয়ত গেয়ে উঠতে পারত—এইপথ চলাতেই আনন্দ, কিন্তু পুষ্করের হঠাৎ মনে হ'ল নিরিবিলিতে কোথাও বসে কাজের কথাগুলো শুনে নেওয়া ভাল। বর্ণা চারদিকে তাকিয়ে দেখে দু'হাত তুলে হতাশ ভঙ্গীতে বলে উঠল, বসবে কোথায় পুষ্কর? ভাখ, ভাখ, একটা গাছের তলাও ফাঁকা নেই, জোড় বেঁধে বসে কেমন পারাবত কূজন করছে, ওরা বিশ্বসংসার ভুলেই গেছে মনে হয়, অতএব আজ আর কোনো চান্স্ নেই গাছের তল পাওয়ার!

পুষ্কর হেসে উঠল, বলল, তুমি এখনো যেন হঠাৎ আগেকার সেই বর্ণা হয়ে উঠতে থাকো। গাছের নিচে ঘাসের আসনে ব'সে কোলে মুখ রেখে গল্পের দিন কি এখনো আছে আমাদের? তুমি কেন মনে করিয়ে দাও 'আমার যে দিন ভেসে গেছে।'

চোখ ফিরিয়ে বর্ণা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, পুষ্কর দেখাল হাত তুলে, চল, ওদিকটায় বসি ঐ বেঞ্চে—ফাঁকা হয়েছে, এসো দেরি করো না।

কোনো কথা না বলে ওরা এগিয়ে গেল সিমেন্টর বাঁধানো সরসীর পারে যেখানে একটা বেঞ্চ এইমাত্র খালি হ'ল।

পাশাপাশি বসে কিছুক্ষণ কেটে গেল, ওরা তাকিয়ে দেখল দল বেঁধে যারা বেড়াতে এসেছে কেমন মুক্ত আনন্দে তারা হাসছে, খেলছে, বেড়াচ্ছে আর কোথাও কোথাও জটলা ক'রে বসে গল্প করছে।

পুষ্কর হঠাৎ বলল, বর্ণা, তুমি কি জানো, এই মুহূর্তে কি ভীষণ একা লাগছে আমার?

—তুমি ত স্বয়ংসম্পূর্ণ।

—সম্পূর্ণতা ছিল তোমাকে আর বিকাশদাকে সঙ্গে নিয়ে যখন চলেছি, তুমি জীবনে, বিকাশদা সাধনে। প্রথম গেলে তুমি, এখন গেল বিকাশদা। আমার এখন সব কিছু ঢেলে সাজাতে হবে ভবিষ্যতের জন্য।

—একা তুমি নও পুষ্কর, আমি আছি। ভবিষ্যতের জন্য তোমার কোনো ভাবনা নেই, সব প্ল্যান ঠিক করা আছে। তোমাকে এসব খুলে বলার জন্যই ত এলাম।

—আমার জীবনের প্ল্যান তোমার মুখে শুনব? কেউ কারো জন্য প্ল্যান করে দিতে পারে, আশ্চর্য, বর্ণা তুমি পাঁচ বছরের ইতিহাস ভুলে গেলে?

পুষ্করের বাঁ হাতটি দুহাতে তুলে নিয়ে বর্ণা বলল,—তোমার সঙ্গে আজ কোনো তর্ক অভিমান নয়, জরুরী কথা সহজ করে বলব। শান্তভাবে শোনো।

পুষ্কর তাকাল বর্ণার দিকে, আমোঘ দৃষ্টি বর্ণার, পুষ্কর চোখ ফিরিয়ে নিল, পশ্চিম আকাশে গড়ের মাঠের প্রান্তে পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাবে আকাশ লালে লাল এদিকে বাড়ি ফেরার পালা, রেড রোড দিয়ে অন্তহীন স্রোতে গাড়ি গাড়ি শুধু গাড়ি, কলকাতার ব্যস্তজীবনে বিকেল নামল, ঘরে চলেছে ঘরে যারা যাবার। পুষ্কর ফিরে তাকাল বর্ণার দিকে, বলল,—তোমার প্ল্যান শুনব।

—ভেবোনা খুব মস্ত ব্যাপার, পুষ্কর, আমরা বেশ টের পাচ্ছিলাম কয়েক-মাস ধরে ভাণ্ডারী সাহেব আর বিকাশদা সঞ্জীবন ফার্ম ছাড়বেন, মালিকদের সঙ্গে ভাণ্ডারীর গোলমাল চলছিল। আমি জানতাম। ধুরন্ধর এই ডিরেক্টর কি করে যে বিকাশদাকে টোপে গাঁথলেন তোমাকে একটুও ডিস্টার্ব না করে তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতাম আমরা।

—আমরা মানে তুমি ছাড়া আর কে?

—জয়নাথ আর আমি।

—জয়নাথকে এর মধ্যে কেন? ওটা তোমাদের পার্সনাল থাক।

—শোনো যা বলছি। জয়নাথকে আমি বললাম, কিছু একটা আর্গানাইজ কর। ডিরেক্টর এটা ভেঙেই নূতন গড়বেন, চল আমরাও তাই করি। জয়নাথ ডিটেল্‌স্ ধরে ধরে কাজে এগিয়েছে, ও মার্কেট জানে। ও প্রচুর টাকা রিমুভ্ করেছে এখান থেকে, নূতন ফার্ম খোলার সব ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে, বাড়ি ঘর যন্ত্রপাতি মালমসলা কিছু বাকী নেই। এখন শুধু তোমাকে রাজী করানো তুমি যে নূতন স্যাম্পল করছ পুষ্কর তার ফর্মুলা, টেক্‌নিক্যাল নো-হাউ নিয়ে তোমাকে আসতেই হবে এই নূতন ফার্মের লাবরেটরিতে। সঞ্জীবন ফার্ম আপনিই বন্ধ হবে, জলের মত পরিষ্কার তাই পথ আমাদেরও দেখতে হচ্ছে।

—বর্ণা, থামো, চুপ কর। বলে উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল পুষ্কর।

—থামব কেন? তুমি আজ বলতে দিয়েছ আমাকে। বর্ণাও উঠে দাঁড়ায় আইসক্রীমের আঠালো হাত রুমালে ঘষতে সুরু করে।

পুষ্কর পকেট থেকে চিনেবাদামগুলো ছুঁড়ে ফেলতে থাকে হাত উড়িয়ে। বলে—তুমি বিশ্বাসঘাতক।

—একবার ঠিক একথা বলেই আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলে। সে ভুল আবারও করবে?

—কোনো ভুল নেই, বর্ণা। আমাকে অন্যায়ভাবে কিছু দিতে এসো না, আমি চাইনে কিছুই কারো কাছে।

—পুষ্কর, তোমার কথা আমি না ভেবে পারিনে তোমাকে যা দিয়েছি তা ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। তুমি তার কি বুঝবে? তুমি কি মন নিয়ে রিসার্চ কর?

হাঁটতে সুরু করেছে দু'জনে। সন্ধ্যার আলোতে ম্লান হয়ে আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পথের আলো, সবাই ফিরে যেতে সুরু করেছে ততক্ষণ। কেমন এক রহস্যে জড়ানো এই স্মৃতি মহলের পরিবেশ, পুষ্করের মনে হয়। সারারাত্র তারার আলোয় স্নান করে পবিত্র হয় দিনে সূর্যের তেজে জেগে থাকে প্রতিদিন চিরন্তন হয়।

হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এগিয়ে ওরা আবার জনেই বসে পড়ল।

গভীর আন্তরিক সুরে বর্ণা বলে উঠল,—আমাদের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার ওপর, তুমি এগিয়ে এস, ইতস্ততঃ করবার কিছু নেই।

—বর্ণা, তোমাদের টাকা, তোমাদের ফার্ম, তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জয়যুক্ত হোক। জয়নাথকেই তুমি জয়ী কর। আমাকে ডেকো না।

—জয়নাথকে তুমি ঘৃণা কর জানি, আমাকেও?

—জানি না। একটা প্রশ্নের জবাব দাও, সব ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারো শুধু আমাকে ধরে?

—মন দিয়ে চিরদিন পারি, দেহ নিয়ে আর পারিনে।

—কেন?

—জয়নাথ নিয়েছে জোর করে।

—বর্ণা! পুষ্কর চিৎকার করে উঠল।

—ঘৃণা করবে তুমি আমাকে? আবার সেই অমোঘ দৃষ্টি তুলে বর্ণা তাকিয়ে থাকে পুষ্করের দিকে। কোনো কথা নেই। বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ে সেই চোখ থেকে। বর্ণা নীরবে কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে পুষ্কর তুমি বিজ্ঞানী। একটু রিসার্চ করে ভাখ, এই বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডের শিরায় শিরায় অণুতে অণুতে কি জ্বালা, কি ব্যথা, কি কামনা, তাকে ডায়সেক্ট করে ভাখ, আলাদা করে ভাখ দেহের জটিলতা মলিনতা থেকে। তুমি একটা নূতন রিসার্চ কর পুষ্কর, আমার মনের মূল্যের পরিমাণ তুমি বের করে ভাখ। পুষ্কর উঠে দাঁড়াল। চুপ করে থেকে বলল, চলি। বাড়ি যাও।

—কিছুই বলে যাবে না?

—না।

হন হন করে এগিয়ে চলে গেল পুষ্কর। আকাশভরা উজ্জ্বল তারার মালা।

ময়দানের ফাঁকায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্র শোভা দেখে পুষ্কর যেন অন্তহীন বিস্তারে ছড়ানো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হিসেব মিলিয়ে দেখে। আবার দেখবে নিস্তব্ধ গভীর রাত্রির কোলে উত্তর আকাশ দিগন্তে চন্দনবর্ণ একক নক্ষত্র ধপ্ ধপ্ করছে আর তার পাশে অপরাজিতা রং ছোট তারার স্থিতি অপরিদৃশ্য অন্য কোন রহস্যময় নক্ষত্রপুঞ্জের ছায়াপাতে।

ফুলে ঘ্রাণ ছিল

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সুধাকান্ত দেখল এক রূপসী কন্যা সারা দেহে ধবধবে শাদা জ্যোৎস্না মেখে পালঙ্কে শুয়ে আছে। নিয়নবাতির নীলাভ আলোয় সে নারী এখন অলৌকিক। সুধাকান্ত নামক এক যুবক এই ঘরে উপস্থিত একথা সে ভুলে গেছে কি? সুধাকান্ত হৃদয়ে স্মৃতির রজনীগন্ধা ফুটিয়ে বসে আছে। সেই স্মৃতি সৌরভ তাকে কখনও অশান্ত করে তোলে। কখনও সে স্নিগ্ধ মধুর আবেশে বিলাসী হয়ে ওঠে। তখন বৃষ্টির পর প্রভাতকালের প্রথম রোদ্দুর হয়ে এক চিলতে হাসি তার ঠোঁটে লেগে যায়। এই সময় ছোট একটি মেয়ে, পরনে হলদে-সবুজ ফ্রক, আকাশে উড়ছি এমন ভাব সেই শ্রাবণী বলছে, কতদিন পরে এলে? সেই গরমের ছুটির পর কের এই পুজোয়। মাকে ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে থাকতে ভালো লাগে?

না-বালক না-যুবক সুধাকান্ত হেসে বলে, মোটেই ভালো লাগে না। আর···আর

ওর ঠোঁট থেকে কথা ফুরিয়ে যায়। তা গিয়ে চেপে বসে শ্রাবণীর জিহ্বায়, আর···আর···আর কি সুধাকান্তবাবু?

তখন সুধাকান্তবাবু এক গর্বিত যুবক বনে যায়। লম্বা লম্বা চুল দিয়ে ঢাকা-চোখ দুটি বিস্ফারিত করে তাকায়। ওর সুধাকান্তবাবু এই নাম বলার ভঙ্গি তাকে খুশি করে। প্রচণ্ড বিদ্যুত চমকে বৃষ্টির খবর পেয়ে একটি ময়ূর পেখম মেলে নেচে ওঠে তার হৃদয়ে। একটু মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে, আমার মন কেড়ে রেখে দেয় এখানে কোন এক শ্রাবণী। ওখানে—পাড়াগাঁয়ে শ্রাবণী কোথায়?

—এই এই তুমি ভীষণ দুষ্টু হয়েছ। এক কিল দেব।

সত্যি সত্যি বুঝি কিল মারবে এমনি মুষ্টিবদ্ধ হাত নাচায় সে। নেচে ওঠে শ্রাবণীর চোখের মণি দুটি। বাম গালের আশ্চর্য মোহময় তিলটি সুধাময়ের চোখ ধাঁধাঁয়। কথা বললে সে আন্দোলিত হয়। কখনো নিচে নেমে ওর ঠোঁট ছুঁতে চায়, কখনো বা সেই তিলটি কুচকে ছোট হয়ে যাওয়া শ্রাবণীর চোখের দিকে এগিয়ে যায়। সেই তিল সুধাকান্তের মন তোলপাড়

করে দেয়। বলে, কই কিল মারো!

কি আশ্চর্য অমনি সেই বালিকা-হাতের মুষ্টিবদ্ধ আঘাত তার পিঠে পড়ল, ঠিক সুধাকান্তের হৃদয় যেখানে তার বিপরীত দিকে।

সুধাকান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে শ্রাবণী। তারপর ওর নরম গাল তার পিঠে স্থাপন করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সুধাকান্তের মনে হল বালিকা শ্রাবণী হঠাৎ বড় হয়ে উঠছে। এমন ভাবে সে আছে কেন? মৃদু মৃদু কাঁপছে কেন? ও কি কাঁদছে?

এক সময় ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে শ্রাবণী বলল, এই।

উ

তোমার লেগেছে?

হ

খুব

হু

এই বল না

কি

তোমার ব্যথা লেগেছে?

হ। খু-উ-ব মিষ্টি…

তড়িতাহত হয়ে ছিটকে সরে গেল শ্রাবণী। একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে জিব ভেংচে কিল দেখিয়ে এক ছুট।

সেই শ্রাবণী এখন শুয়ে শুয়ে পা নাচাচ্ছে। গোড়ালির উপর লাল শাড়ি উঠে আছে। দুধ-সাদা লক্ষ্মীর পা দুটি চুম্বন আশে খয়েরী রঙের চওড়া পাড় লুটোপুটি খাচ্ছে। মেয়েরা পা নাচালে সুধাকান্ত বিরক্ত হয়। তার দৃষ্টি সরিয়ে জানলা গলিয়ে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল। টলটল করেছে জল। সান বাঁধানো সিঁড়ি হাটি হাটি পা পা জলের মধ্যে নেমে গেছে। এক সময় এই ঘাটে বসে ছিপ হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে তার। কখনো শ্রাবণী এসে গল্প করেছে। কখন আবার ওর সামনেই টুপ করে জলে নেমে পড়েছে। একটু পরে ভিজে শরীরে ধীর পায়ে যেতে যেতে বলেছে, ও মশাই, মেয়েদের স্নানের সময় এভাবে বসে থাকা কেন?

অবাক হয়ে যায় সুধাকান্ত। এই বালিকা কোথা থেকে এই সব কথা শেখে। কে বলেছে তাকে একথা বলতে?

—ভিজে শরীরে তুমি ঠিক মাছেদের মত।

—হু তোমায় বলেছে।

তারপর জিব ভেংচে সে দৌড়ে পালিয়েছে।

সুধাকান্তের চোখ থেকে সেই দৃশ্যও সরে যায়। ফলসা গাছটার উপর চোখ আটকে যায়। ইচ্ছে হয় শ্রাবণীকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ঐ গাছে তুলে দেয়। ও ফলসা পেড়ে দেবে তার হাতে—সে অঞ্জলিবদ্ধ করতলে তা গ্রহণ করবে। এই ভেবে সে শ্রাবণীর দিকে তাকায়। অমনি স্বপ্নের দিনগুলি প্রজাপতি হয়ে জানলা গলে পালিয়ে যায়।

শ্রাবণী শাড়ি পড়েছে। লাল টকটকে রঙ। নাভির নিচে। বুকের উপর আড়াআড়ি পড়ে আছে আঁচল। সুধাকান্ত বিরক্ত হয়। আবার সারা দেহে কিসের ভালোলাগা স্রোত বহে যায়। শ্রাবণী এভাবে স্থির হয়ে কেন শুয়ে আছে? তার এই অবস্থা কি সে নিজে টের পাচ্ছে না? সুধাকান্তের চোখ যে সেদিকে ওকি বুঝতে পারছে না?

এইবার সুধাকান্ত ওর মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শ্রাবণী এই প্রথম বোধহয় পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে। তার কণ্ঠস্বরে রুষ্টতা প্রকাশ পায়; কি দেখছো?

সুধাকান্ত ওর সিঁথির সিঁদুর দেখছিল। টকটকে গাঢ় লাল সে রঙ। অনেকখানি স্থান রঞ্জিত হয়ে আছে। সুধাকান্ত একটু চমকে গেল। তার দৃষ্টিতে কি শ্রাবণী লোভাতুর দুটি চোখ ধরে ফেলেছে? নাকি কোন অজানা আশংকায় তার ভয় হয়?

সুধাকান্ত চোখ নামিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করে। ধীরে ধীরে বলে, বিয়ের পর এই প্রথম তোমায় দেখলাম। দেখছি সিঁদুর পরলে কেমন দেখায়।

শ্রাবণী একটি কথাও বলল না। হাসল না। কাঁদল না। ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশ করল না। শুধু তার বাম গালের সেই তিল একটু কেঁপে গেল। উবু হয়ে মাথার দুপাশে হাত দুটো ভাঁজ করে নিঃশব্দে শুয়ে থাকল।

বিষণ্ণ সুধাকান্ত ডান দিকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চোখ ফেলল। বাম দিকের দেয়াল সুধাকান্তের হাত কাঁধ মাথার ফাঁক দিয়ে প্রতিবিম্ব ফেলেছে। দরজার অনতিদূরে সেই পেরেকটা দেখা যাচ্ছে। পেরেকটার সঙ্গে একটু লাল সুতো জড়ানো। একটা হ্যাঙার ঝুলছে সেখানে। খালি। মেশোমশায়ের কালো কোটটা নেই। হয়ত ধোপাখানায় পাঠানো হয়েছে।

একটু হাসল সে। বাবলুর কথা মনে পড়ে। সে একদিন সুধাকান্তকে বলেছিল, জানো সুধাদা, মা-মা ছোড়দির উপর ভীষণ রেগে গেছেন।

সে হেসে বলল, কেন রে ?

—মা ছোড়দিকে বকছিল। বলছিল, তুমি একটি আস্ত গাধা। কোথাকার কোন প্রকাশকে বিয়ে করবে বলে গোঁ ধরেছ। কেন সুধাকান্তকে ধরে রাখতে পারলে না ? কেন সুধাদা তুমি দিদিকে বিয়ে করলে না ? তা হলে বেশ মজা হতো। প্রকাশদা তোমার মত নয়, তবু দিদি ওকে বিয়ে করল !

সুধাকান্ত সেদিন বিষণ্ণতা গোপন করে একটু হাসি ছিটিয়ে মুখে বাবলুকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

মাসিমা বা বাবলু কিম্বা শ্রাবণী জানে না সেই কালো কোটটার কথা। সেই পেরেক ছাড়ায় সুধাকান্তকে চার বছর আগের এক দুপুরে টেনে নিয়ে যায়।

নির্জন বাড়িতে সেদিন মাসিমা একা ছিলেন। কলেজ কিসের জন্য ছুটি হয়ে যায়। বাড়ি না ফিরে মাসিমার বাড়ি চলে যায় সুধাকান্ত। ওকে দেখে মাসিমা খুশিতে ঝলমল করে উঠলেন। বললেন, ভালোই হয়েছে। তুই একটু বোস, আমি কমলাদের বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। কেন ডেকে পাঠিয়েছে। এই যাব আর আসব। ঘণ্টা খানেক। শ্রাবণী স্কুল থেকে ফিরলে চা করতে বলিস।

একটু তন্দ্রা ভাব এসেছিল। কতক্ষণ অতিবাহিত হয়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ মাসিমার কণ্ঠস্বর চমকে দিল তাকে। তিনি সেই কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রয়েছেন, বিস্ফারিত হয়ে বলছেন, একি ! এখানে আমি হারটা রেখেছিলাম, নেই তো।

সুধাকান্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মাসিমা তাকে লক্ষ্য করেই বলছেন, হ্যারে অন্য কেউ ঢোকেনি তো ঘরে ?

উহু। অস্ফুট আওয়াজ বেরুল বুঝি সুধাকান্তের কণ্ঠ থেকে।

তাহলে ?

এই 'তাহলে' এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে তাকে বিদ্ধ করল। তাহলে ? তাহলে ?...তাহলে ?...

সুধাকান্ত কি পাগল হয়ে গেল ? সর্প দংশনে আচ্ছন্ন মানুষ হয়ে ভাঙ করা হাতের উপর ঠেস দিয়ে রইল সুধাকান্ত রায়চৌধুরী এক বিমূঢ় যুবক। রক্ত শূন্য ভাষী দেহ তার। এক সময় ফিস ফিস করে বলে, ভালো করে মনে করে দেখুন কোথায় রেখেছেন।

—না, না, দেখার কিছু নেই সুধা। তোর মেসো অফিসে বেরুবার পর আমি এই কোটের পকেটেই সেটা রেখেছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে।

এই কথা শোনার পর কয়েকটি ভ্রমর তার কানের ভিতর নৃত্য শুরু করল। মেরুদণ্ডবাহি হিম শীতল জলপ্রপাত তার সারা দেহে বহে চললো। এমন সময় তার ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। কিসের ঘ্রাণ ভেসে আসে? শ্রাবণী আসছে না?

শ্রাবণীকে দেখে আরকিমিডিসের মত লাফিয়ে উঠলেন মাসিমা, এই তো, এই তো সেই হার। কখন গলায় পরলি তুই?

—এ'তো স্কুলে যাবার আগে। তোমায় বলতে ভুলে গেছি মা।

—ইস আমি যে কি চিন্তায় ছিলাম।

আর আমি? মাসিমার সেই সন্দেহের বিষঢালা চোখ কি বলতে চাইছিল? হাসল সুধাকান্ত। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, এক শ্রাবণী ছাড়া কেউ নেই এ ঘরে। শ্রাবণী উবু হয়ে শুয়ে আছে পূর্বৎ। পিঠে অনাবৃত ত্বক ধবধব করছে। জ্যোৎস্নায়?

এখন সুধাকান্ত একটা কিল মারতে পারে ওর পিঠে। ওর পিঠে গাল ছোঁওয়াবে? তারপর সুধাকান্ত বলবে, এই···এই···

কি

রাগ করলে?

কেন?

এই যে আমি···

চুপ করলে কেন? বল

এই, এই শ্রাবণ···

কি?

কিছু না?

না, এসব কিছুই বলা হয় না। ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। এক পা এক পা খাটের কাছে যায়। শ্রাবণীর পিঠে হাত রাখে না। কিল মারে না। একটু ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে। সেই পরিচিত সুঘ্রাণ আসে। করমচা ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসে। ছাদের চিলে কোঠায় কাড়াকাড়ি করে করমচার আচার খাওয়ার কথা মনে পড়ে। তখন শ্রাবণী ছিল বালিকা। সে এক গর্বিত, উদ্ধত তরুণ। দশ বছর কেটে গেছে।

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলে সুধাকান্ত, শ্রাবণ, ওঠো।

কতদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা। ওঠো।

ঠোঁট ফুলিয়ে শ্রাবণী বলে, সে তো তোমার জন্যেই। সেই কবে কোথায় চাকরি নিয়ে চলে গেলে, ঠিকানা পর্যন্ত জানাও নি।

—না, শ্রাবণ এসেছিলাম একদিন। এসে শুনেছি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে।

—জানি। মা বলেছে, বাবলু বলেছে।

এই বন্ধ ঘর ভালো লাগছে না। সুধাকান্ত ছটফট করে উঠল। বলল, চলো একবার ছাদে ঘুরে আসি।

শ্রাবণী উঠল।

দু'জনে পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মাঝপথে থেমে গেল সুধাকান্ত। শ্রাবণী তখন এক ধাপ উপরে, থমকে দাঁড়াল। মৃদু আলো এসে ওর বাম দিকের তিলটি উজ্জ্বল করে দিল। সুধাকান্ত ব্যাকুল হয়ে ওর হাত ধরে ফেলল।

—ছাড়, মা ছাদে আছেন। ধীরে বলল সে।

সুধাকান্ত হাত ছেড়ে দিল। সে অবলীলায় বলে উঠল, শ্রাবণ, আমের কুশি আছে? কাঁচা আম?

—কেন? বিস্মিত শ্রাবণী তাকিয়ে থাকে।

—নিয়ে আসবে? আচার বানাবে তুমি। চিলে কোঠার ছাদে আমরা লুকোচুরি করে খাবো।

মৃদু শব্দ করে হাসল শ্রাবণী। একটা নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস শুনলো কি সুধাকান্ত? সে সুধাকান্তের হাত ধরে বলল, এসো, ছাদে চলো। বহুদিন পর তোমায় দেখলে মা কী যে আনন্দ পাবেন।

সখা

সত্যেন্দ্র আচার্য

তিনি ভোরের আলো দেখলেন। পাহাড়। ভোরের হিজিবিজি আরো ফর্সা হতে হতে স্পষ্টতর হচ্ছিল। চতুর্দিকের এই পরিবেশটা খুব নীরব, শান্ত বলে মনে হল। এই স্নিগ্ধ হাওয়ায় তিনি অনুভব করলেন এখন হেমন্ত অপস্রিয়মান অথচ হিংস্র শীত এখনো পাহাড়ের ওপর থাবা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে নেই। একটা অনড় ক্লান্তিতে চোখের পাতা বোজা বোজা হয়ে এলে হঠাৎ কখন মনে হল ভোর হয়ে গেছে। তিনি হাঁটলেন।

দেখতে দেখতে রোদের ছায়া ঘন হচ্ছিল। বেলা বাড়ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ষ্টেশন পর্যন্ত চলে এলেন। ঘড়ি দেখে বুঝলেন, তিনি অনেকক্ষণ তাঁবু ছেড়েছেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল সকলে তাকে ভয় করছে। ঘৃণা করছে। পর পর তাঁবু পড়ার পর থেকে সকলে তাঁকে দেখে। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকে। আশ্চর্য রকমের ঘৃণায় যেন তাঁর ছায়া থেকে সকলে সরে দাঁড়াতে চাইছে। তাই সারারাত বিনিদ্র কেটেছে। সারারাত তাঁবুর চৌক জানলা দিয়ে পাহাড় দেখেছেন। তারপর ভারী ভারী চোখের পাতায় এই অন্ধকারের ভেতর তিনি একসময় অনুভব করলেন, ভোর হয়ে গেছে।

পরিকল্পিত শহরের তিনি রূপকার। এই অরণ্য প্রান্তর জনঅরণ্যে রূপান্তরিত হবে, সব অসুন্দর,সব অপরিচ্ছন্নতা, আবিলতা কাল থেকে ডিনামাইটের অমিত অগ্নিক্ষেপে ধ্বংশ করে দেবেন, চোখের ওপর পাহাড় ফাটিয়ে সমস্ত এই দেহাতী মানুষগুলিকে কাল থেকে তিনি বুঝিয়ে দেবেন, পৃথিবী মানুষের। ঈশ্বরের নামাঙ্কিত মাত্র। তিনি পরিকল্পিত একটি পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে দিয়ে যাবেন, এই পরিচিত, অরণ্যচেরা আদিম রূপটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, একেবারে নতুন তুলি দিয়ে শহর আঁকবেন যার নকল চিত্র ব্লুপ্রিন্টে তিনি ধরে রেখেছেন।

বদলাল। কত বদলাল। দেখতে দেখতে শাবক প্রজাপতির আর কোন চিহ্নই রইলনা সাবেকের। সব বদলাল। এই স্টেশন চত্বর। রাস্তার ওপর লুটোনো ছায়া। ফুলের গন্ধ, প্রজাপতির রং, পাহাড়, সবুজ, সব বদলে গেল।

মরা মরা ঘোড়াগুলো জীর্ণ একার সঙ্গে দরদের গাঁটছড়া বেঁধে নিশ্চুপ

দাঁড়িয়ে থাকে স্টেশনে। আর তাদের ক্ষীণ দৃষ্টির ওপর দিয়ে বাঁধান, চওড়া মেটাল রোড ধরে বাসগুলো যেন উড়ে চলে। পাশে পাশে সজ্জিত পশরা। রেডিওর দোকান। সৌখিন ফার্নিচার। কফি ঘর, মদের দোকান। কত বদলে গেছে। শহরের বুকের ওপর কত কলকারখানা গড়ে উঠছে দিনদিন, কত ব্যস্ত সকলে। পরিচিত মুখ যে চোখেই পড়ে না। অপরিচিত মুখ সৌখিন পশরা সাজিয়ে বসে আছে। পাহাড়ী ফুলের অমিশ্র সৌরভে মহুয়া গাছের ছায়া ভেজেনা এখন। তাই বহুদিন লছমনের বিপন্ন চোখের ওপর প্রজাপতি নেই।

শুধু আছে টিকলি। এখনো তাই ত্রুটি করেনা লছমন। এখনো তাই বিপন্ন চত্বরে এসে দাঁড়ায়। পাহাড়ের মাথা আর দেখা যায়না। নিঃশ্বাস তাই ঘন হয়। হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়িতে ঢোকে লছমন। টিকলি, টিকলি—

চল্। সামনে এসে দাঁড়ায় টিকলি। আঁচলটা বুকের ওপর তোলে।

জানিস কী বলে? নিঃশ্বাস আরো দ্রুততর হয় লছমনের। বলে বিক্রী কর। ঘোড়াটা বিক্রী কর। বলে কিনা ওজাল।

ঠিকই বলে। কাপড়ে হাত মোছে টিকলি।

লছমন আর দাঁড়ায় না। না, সব কেমন বদলে যাচ্ছে। পাহাড় দেখা যায় না। ফুল। ফুলের সৌরভ। যেন ভালবাসাও না।

অথচ এই ঘোড়াটা কত প্রিয় ছিল একদিন। স্টেশন চত্বরে এসে দাঁড়াত লছমন। শরীরের ওপর একটা আশ্চর্য ঢেউ তুলে তার এক্কাটার সামনে এসে দাঁড়াল একদিন টিকলি।

লছমন লোলুপ তাকালে টিকলি হেসেছিল। ঘোড়াটার পেটের নিচে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে বলেছিল, তরতাজা ঘোড়াটা তোর চাইতেও তেজী দেখি। আমাকে দেখেও তেজ দেখায়।

কি যেন হেসে হেসে বলতে যাচ্ছিল লছমন, টিকলি আরো জোরে হেসে ফেলে বলল, তোর সোহাগী এক্কা তো শুনেছি স্বগ্‌গে পর্যন্ত নিয়ে যায় মানুষকে। আমাকে চড়ানা একটু।

লছমন কি যেন ভাবছিল, খুব জোরে জোরে বিড়ি টানছিল। টিকলি, বিড়ির ধোঁয়া তার দিকে আসছে দেখে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল অন্যদিকে। দিয়ে বলেছিল, স্বগ্‌গে না হয় নাই গেলে, নরকে?

তেমনি হাসতে হাসতে লছমন গাড়ির সঙ্গে ভাল করে জুড়ে দিল ঘোড়াটাকে। ওঠ। চাকায় বাঁধা ঘুঙুর ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা একটা মিশ্রিত শব্দ

তুলে ছুটল। স্টেশন, ট্রেন লাইন, আখের ক্ষেত, ফলন্ত ভুট্টার জমি একে একে সব ছাড়িয়ে নদীর বাঁ দিক ঘেঁষে ঘুরল। লোকজন আর যখন লছমনের চোখে পড়লনা তখন ঘোড়ার লাগাম আলগা করে ডেকেদিল—এই টিকলি।

সাড়া দিলনা টিকলি। চোখ নামাল।

জমাট ছায়ার ওপর দিয়ে গাড়িটা খানিক গড়িয়ে হঠাৎ থেমে গেল।

থামলি? ভড়ানো অইটুকু বলে অরণ্যছায়ায় চোখ রাখল টিকলি।

নাম।

না।

কেন না? ওর লজ্জায় রাঙা হওয়া ঠোঁটের দিকে তাকাল লছমন। না কেন, লছমন আরো কাছে এসেছিল।

অরণ্যেরা এই পরিবেশে কেউ কোন কথা বললনা কিছুক্ষণ। এতক্ষণ পরে টিকলি বলল, চল, ভয় করে।

কিসের ভয়। কপালের ওপর থেকে চুল মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিল পেছন দিকে। ভয় কিসের। সাহস দিল অস্পষ্ট গলায় লছমন।

না। আলতো হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল টিকলি। না।

টিকলির শরীরটাকে বড় যত্ন করে নামাল এক্কা থেকে। লছমন পাশে দাঁড়াল এই অরণ্যের ওপর। হাত ধরে বলল, এই নরম ছায়ার ওপর শো।

এই পুরনো দিনগুলো লছমনের চোখের ওপর উঠে এলে লছমনের চোখ ভিজে এল। টিকলি কোমরের ভাঁজে কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে বলল, একি তুই কাঁদছিস?

কই, না তো। চোখ মোছে লছমন। চোখ তোলেনা। চোখের ওপর আর পাহাড় দেখেনা লছমন আগের মত এখানে দাঁড়িয়ে। টিকলি হাত ধরে। কর্কশ আঙুলের ওপর কোমল আঙুলের স্পর্শ তুলে দিয়ে বলে, কাঁদছিস, কী হয়েছে তাতে?

কী হয়েছে তাতে? যেন শিশু হয়ে গেছে লছমন।

কাঁদতে কাঁদতে বলে, জানিস ওরা কী করবে? ঘুরে দাঁড়ায় লছমন। তাকায়। বলে, যে রুটি যোগাল এতদিন, তোকে আমাকে বেঁধেদিল, আজ সে জঞ্জাল?

টিকলি তাকায়।

জানিস ওরা কি করবে? লছমন তাকায়। বেচে দেবে চিড়িয়াখানায়।

টিকলি চোখ নামায়।

লছমন হাত ধরে টিকলির। বলে, বাঘে ভালুকে রক্ত খাবে টিকলি তুই দেখবি ?

প্রশস্ত মেটাল রোডের ওপর প্রথম যেদিন লাইট জ্বলেছিল, সে জলুস দেখে এসেছিল লছমন। একটা নতুন শিহরণ অনুভব করেছিল। বাড়ি ঢুকেই ডেকেছিল, টিকলি, টিকলি—

ব্যস্ত পায়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল টিকলি। কী—

অন্ধকার আর থাকলনা। তবু কেমন ভয় করে। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে শহরটা। কেমন ভয় করে টিকলি।

আমারো।

না না কিসের ভয়। আলোয় কত ভরে গেছে শহর দেখিয়ে আনব কাল।

তবু কেমন ভয় করেছিল লছমনের। আলোর ওপর, রাস্তার দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে সব কেমন বদলে যাচ্ছে। সেও কম বদলে গেল নাকি ? কত সহজে চাবুক ছেড়ে চাকুরে হয়ে গেল। অতীতের আজ কিছু নেই লছমনের চোখের ওপর। এই নতুনের সঙ্গে পুরনো দিনের গ্রন্থি হয়ে কঙ্কালসার ঘোড়াটা এখনো বেঁচে আছে যা।

খুব ক্লান্ত দেহে আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল লছমন। ঘুমোনোর আগে টিকলিকে অন্ধকারে ছুঁল লছমন। তারপর টিকলির শরীর তার নিঃশ্বাস অনুভব করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল লছমন। সে যেন এসে গেছে একটা অত্যুজ্জ্বল নগরীর ওপর। এই নগরীর শোভা দেখল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লছমন আকাশ দেখল। ফুল, পাখি, প্রজাপতি খুঁজল, কিন্তু চোখে পড়লনা। আবার হাঁটল সে। কি সুন্দর শহর একটা। সে মানুষ দেখল। শহরের রূপ। অট্টালিকা, মসজিদ, সিনেমা হল, গীর্জা, সুপার মার্কেট মন্দির, এবং বেশ্যালয় পাশাপাশি দেখল। সে ভাবতে চাইল পাপ এবং পুণ্যের বসতি এত সংলগ্ন কেন। সে পাপের কাছেও না, পুণ্যের সীমানাতেও দাঁড়ালনা। হাঁটল। পাপ-পুণ্যের অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার সে চাইলনা।

এই চকচকে সাজানো শহরের ওপর মানুষগুলিকে খুব ভদ্র দেখাল। সে দেখল প্ল্যান্ট, ফ্যাক্টারী, পাতাল রেলের চিত্র, ফসল বাড়াও বিজ্ঞাপন। রংবেরঙের মেয়েমানুষ, স্তনাবনত যুবতী, স্তনবতী কিশোরী, আর

কিছু কেবল যুবক পুতুল। হাঁটল সে। চকচকে রাস্তা। বিজলী আলো। কলরব। হাসি। নিয়ন বাতি। শাড়ি, ব্লাউস। স্যুটের কাপড়। এবং শো কেসে-এ পুতুলের বুকের ওপর ঝুলোনো ব্রেসিয়ার—এই সব দেখতে দেখতে এগোল। সে শহরের যন্ত্রতন্ত্র লটারী টিকিটের দোকান দেখল। একটা টিকেট কিনে লক্ষপতি হতে বাসনা হল। পকেটে হাত দিয়ে প্রচণ্ড দুঃখে চীৎকার করে উঠল।—ঘুম ভেঙে গেল লছমনের।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সে প্রথমে খুব হাসল নিজে নিজে। কিন্তু বিছানা খুঁজে একটা বিরাট ভয় তাকে ঘিরে ধরল। লছমন ঘুম চোখে অবসাদ এবং জড়তা কাটিয়ে চারিদিকে তাকাল। রোদ উঠেছে। রোদের নরম ছায়া তার বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সে উঠে বসল। বিছানা দেখল। বাইরে এসে দাঁড়াল।

টিকলি। ডাকল লছমন। খুঁজল, দেখল টিকলি ব্যস্ত পায়ে ফিরছে। একটু উঁচু গলায় ডাকল, লছমন, শোনো।

দাঁড়াল টিকলি। খিলখিল করে হেসে ওকে আগের মত তুষ্ট করতে চাইল।

কখন উঠলি?

কোথায় গেছিলে? লছমন কথার ওপর জোর দিল।

বাইরে। বড় মিষ্টি করে হাসল টিকলি। বলল, এ্যাই, ভাখো, এই ট্রানজিস্টারটা লালাপ্রসাদ দিল। বলে হাসল। হাঁসতে হাসতে বলল, তুমি যখন থাকনা, তখন সময় কাটাতে কী যে কষ্ট হয়, সে তুমি বুঝবে কী করে? হাসির রেখা তখনো ঠোঁটের ওপর রেখে দিল টিকলি। যখন খুশী দাম দেব বলেছি। একটু কাছে সরে এসে বলল, বড় ভাললোক লালাপ্রসাদ। না দিলেও চাইবেনা।

লছমন পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকলিকে দেখছিল। টিকলি নরম আঙুল দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান বাজাল। লছমন শুনল। বুঝল লালাপ্রসাদ যত্ন করে দিয়েছে, টিকলির নিঃসঙ্গ সময়টুকু লালাপ্রসাদের ভাল লাগেনা বলে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লছমন এই রোদের ওপর দাঁড়িয়ে, না, বৃথা মায়া রেখেই বা লাভ কি! বরং বেচে দিলে বাঘে ভালুকে মাংস খাবে।

তিন কূল

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

পঁয়ষট্টি বছরের আমিটা। অন্যের কথায়, আচরণে বুঝি আমি বুড়ো হয়েছি। ক'জন ছোটবেলার বন্ধুকে দেখে আন্দাজেও তাই মনে হয়। প্রথম যখন পঞ্চাশের কোঠায় ঢুকলাম,—বলতাম—"আর কি পঞ্চতাল্লিশ ত হোল।"

"...আপনাকে দেখে চল্লিশের বেশী মনে হয় না।"—বাইরের লোক—কথার কথা—তবু সত্যি না বড়লোকের মোসায়েবী—বিচার করতে ইচ্ছা করে না। ভালো লাগে। বয়সটা থামে না। ক্রমাগত গড়িয়ে পঞ্চান্ন পার হোল। বার্ধক্য সয়ে গেল। তখন বলতাম—"ষাট ত' পেরুলো—আর কি বলো।" বড় কেও প্রতিবাদ করতো না। ওই বয়েসটায় দু'চার বছরের আগে পিছু পৃথিবীতে কারও আসে যায় না। আয়নাটাও বলতে সুরু করেছে—পড়ন্ত বেলার পুরবীর সুর। শুধু যখন আমিটা একা হয়ে যায়—আর একটা আমি বার হয়ে আসে। মুখোমুখি বসে। তার বয়স নেই। দেহের ভাঁজে মেদ নেই—চোখের কোলে কালি পড়ে নি। ঘন চামড়া শাদা চুল—চেরা চিবুক—চোরের মত সিঁদ কাটে নি—সাপের মতো আশ্রয় করে নি।

—এর পর থেকে খানিকটা পড়া যায় না। অস্পষ্ট—মনে হয় ভিজে গিয়েছিল. তারপর আবার—।

—তবু বয়েস একটা আছেই। দিন রাত ঋতু পরিবর্তনের হিসেবে। কত? দশটা বছরই হবে। ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট পরা ছেলেটা। হাতে বাঁকান সিকটা। কাঁধে ঝোলা—লম্বা, মস্ত—ওর মত গোটা দুই ঢুকে যায়—কিছুটা আয়াসে—তা হলোই বা। মোটা ছিলকেটা ওর চামড়ার অংশ হয়ে গেছে। বড় লোকের খিড়কী—লাল আলো পল্লী—মেলার আনাচে ভোজবাড়ীর পিছনে—ঘুরে বেড়ায়। অদ্ভুত একটা চ্যালেঞ্জ! তখনও শহর জাগেনি। দুটো রাত জাগা কুকুর ওকে দেখে সরে যায়। ক্ষিপ্র তৎপরতায় হাতের শিকটা কাজ ক'রে চলে। একটার পর একটা ক্ষত চিহ্ন আঁকা হয়—ময়লার বুকে—তলপেটে পাঁজরে। নির্য্যাস বার হয়ে আসে। প্রীতিমের অতিকায় ঝোলাটা ধীরে ধীরে ভারে। কুন্তীর পেটে বাচ্চা এলে যেমন হয়। থলথলে নড়বড়ে—এলোমেলো—ফোলাফোলা। কুন্তীর মত প্রীতিমও ধোঁকে। দুর্গন্ধী বস্তাটা

ওকে আঁকড়ে ধরে—কামুক ভালুকের মত।

আজ প্রীতিম জানে। অদ্ভুত পৃথিবীর আহ্নিক গতি। দূষিত স্নেহ, ময়লা, বিষ—থুতু—বমি করা রক্ত—কি এক ভয়াল চাকার পরিধি বেয়ে ওঠে, নামে। মৃত্যুর আশ্রিত জীবন—জীবনের মুক্তি মরণ।

—সেদিন এসব ভাবতো না প্রীতিম। বয়স, বুদ্ধি, বিদ্যা—সবটাই তখন কাঁচা। আর অবসর! আজ খেয়ার পারে হাতে কিছু সময় নিয়ে পৌঁছে গেছে। এ পারের কাজ শেষ। ওপারের পালে হাওয়া লাগে নি।

—ওঃ সেদিন! শিশির মাখা ছেঁড়া কাগজ, ময়লা পেঁজা তুলো—তোবড়ান টিনের কৌটো—রাংতা, চক্‌চকে তেলা কাগজ। প্রীতিম জানতো—ওর পিঠের বোঝার ঠিক দাম কত। ময়লা, পরিত্যক্ত, দূষিত পৃথিবীর—সূক্ষ্ম মূল্যায়ন—ভারসাম্য ওর ছোট্ট পিঠে।

ক'টি টাকা, হাফ প্যাণ্টের পকেটে অনেক রাতে ও বাড়ী ফেরে। ছোট্ট একটা রুটি কিনে নেয়। বোনটা ঘুমিয়ে যায়। চেটাই মোড়া চা-এর দোকানে দশ পয়সার চা—ওই রুটি বোনটার রাতের খাবার। প্রীতিম ডাকে—রুমনী ওঠ্। অর্ধেক চোখ বন্ধ,—রুমনী খেয়ে নেয়—শুয়ে পড়ে আবার।

প্রীতিম স্বপ্ন দেখে। ঝক্‌ঝকে বাড়ীটা—নীল আলো হলুদ রং আর মখমলের পর্দার আড়ালে অন্য এক জীবন। সে আর এক পৃথিবী। ও যখন অদ্ভুত নিপুণতায়—ক্ষিপ্র হাতে—সরু শিকটার মাথায়—বিষ্ঠার আবর্জনা মন্থন করে জীবনের অমৃত আহরণ করে—ঠিক তখনই ওর মাথার ওপর—ওই নীল ঘরে—হাসি কান্নার উন্মত্ত স্রোত বয়। শৈশব থেকে কৈশোর এমনি ক'রে পার হয়ে গেছে ওর।

এগারো বছরের রুমনী বলে—"দাদা, আমরা এই ঘরে থাকবো? বাঁধানো মেঝেতে পা ঘসে। খোয়া ওঠে না, পায় কাদা লাগে না। রুমনী অবাক হয়। আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। প্রীতিম জানালায় এক মনে ক'টা পেরেক ঠোকে। নীল কাপড়টা পাশে পড়ে থাকে। জানালায় নীল পর্দার স্বপ্ন প্রীতিমের ছেলেবেলার।

"—এবার থেকে আমরা এখানেই থাকবো।" প্রীতিম বলে।

শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম—তিল তিল ক'রে সঞ্চয় করেছে বঞ্চিত নিজেকে নির্মম হাতে। অস্থির ক্ষিদেয়—, বাঁ হাতে, হাফ প্যাণ্টের পকেটে দিনের সঞ্চয়—পাঁচটি টাকা চেপে ধরে, জল খেয়েছে এক পেট—কর্পোরেশনের কলে।

বোনটার রুটির ক'টা পয়সা সরিয়ে রেখেছে শুধু। দশ বছরে—তিন হাজার ছশো তিপান্ন দিনে—মেলায় যায়নি—রাস্তার মোড়ে দশ পয়সার আলুচোলা খায়নি। আশ্চর্যিক নিষ্ঠায়—বাধা—ক্লেশ দারিদ্র হার মেনেছে। পাঁচ পয়সা ভিক্ষা দেয়নি কোন ভিখারীকে। এক পয়সা দান নেয়নি কারও। নিষ্ঠুর সাত্যিকতায়, কঠোর হিংস্র তপস্যায় পেরিয়ে এসেছে আট থেকে আঠারোটা বছর বয়েস।

সামান্য সঞ্চিত টাকা দিয়ে প্রীতিম সুরু করে পরিত্যক্ত ময়লা থেকে অসংখ্য উপাদান—তার ব্যাপারি প্রীতিম। কাগজের মিল—কম্পষ্টের কল—ঢালাই কাচের কারখানা। শহরের আধখানা আবর্জনা ইজারা এখন ওর। পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নেশা—খুঁটিনাটির অসাধারণ জ্ঞান—প্রীতিম—স্রোতের মতো এগিয়ে চলে। ষোল বছরের রমনীর বিয়ে দিয়েছে ও। সুশ্রী, যৌবনা রমনী। প্রীতিম যেন রাগ করে ওর বিয়েতে অযথা খরচ করে। ওর মনে পড়ে, দশ পয়সায় চা কিনে ও রমনাকে ঘুম থেকে ওঠাতো। আধখানা রুটি দিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পরত রমনী। এক যুগ কৃচ্ছ্র-সাধনের হিংস্র বদলা নেয় প্রীতিম। অদ্ভুত! কানাকড়ি কাওকে ছাড়ে না প্রীতিম। কোথাও ঠকিয়ে একটি পয়সা নেয় না। ওর লেনদেন ব্যবসা কঠোর শাসনে বাঁধা। একটু সুবিধা দেয় না কাওকে। একটা সর্বগ্রাসী মোটর চলে। আখ মাড়াই কলের মতো। দাঁতের পেষণে নির্য্যাসের ধারায় অর্থ জমা হ'তে থাকে।

সন্ধ্যায় প্রীতিম একলা। একাকী—নিঃস্ব—সন্ধ্যা—ধীরে গভীর হ'য়ে ওঠে। মুখর সত্তা, অন্তর থেকে ওর কানে কানে কথা বলে—অনেক ত' হোল প্রীতিম। এবার ছাড়ো। কেন এতো পরিশ্রম—আঠার মতো বন্ধন? রমনী আসে—বলে—"দাদা, তুমি ঘর বাঁধো—আমি দেখবো।"

—প্রীতিম সারা দেয় না। সামান্য হাসিটা কতদূর থেকে আসে কে জানে। তবু নেশা কাটে না। আক্রোশ. প্রতিহিংসা, কার ওপর প্রতিশোধ নেয় প্রীতিম! আত্মহত্যা! হারাকিরি!

মাত্র ত্রিশটা বছর। আজীবন পরিশ্রমে মাংসপেশীগুলো ফুলে থাকে। আত্তাকুড়ের পরিচয় জানে প্রীতিম। নীল ঘরও দেখেছে। পর্দার অন্তরালে। একান্ত নিরালায়—ওপর তলার মানুষের অসতর্ক মুহূর্তে। মাতাল স্বামী কেমন করে রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে গ্রহণ করে। দেখেছে প্রোষিত ভর্তৃকার রাত্রি যাপন।

অন্যায়, অমানুষী, দুর্ব্বলতা। খ্যাতির হাত তুলে নমস্কার করার দায় ওর নেই। সমাজের ঘোড়া চাবুককে ছুটিয়েছে। অঙ্কের গাড়ী দোহন করেনি প্রদোষের অন্ধকারে। ওর মাথাটা অনাবশ্যক উঁচু হ'য়ে চলে। কাঁধ দুটো অযথা সোজা—রুক্ষ। তরোয়ালটাও ঈষৎ বাঁকা। ওর মেরুদণ্ড—মাথা সবটাই ঋজু সরল-রেখা।

প্রীতিম ক্লাবে আসরে যায়—নাচে যোগ দেয়। সুন্দরী মেয়েরা আসে। বেচে কথা বলে—অন্তরঙ্গ হ'তে চায়। ওই অবুঝ, অর্থহীন আক্রোশটা তখন বেরিয়ে আসে। ওর চাউনিতে, কথায় তাচ্ছিল্য খেলা করে—মার্জ্জারীর প্রশ্রয় যেন মূষিকের খেলাঘরে। চোখে ধারালো ব্যঙ্গ—প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতা। ওরা হিংসা করে, ভয় করে, ঘৃণা করে—তবু আশেপাশে ঘুর ঘুর করে। প্রীতিম স্পিটুনে থুতু ফেলে। ওরা দেখে কি!

এই নিয়ে তিনদিন দেখা অণিমার সঙ্গে। শেষদিন ও প্রীতিমের ফ্লাটে দু'ঘণ্টা কাটিয়ে গেছে। এ ভালোই হোল। ব্যাপারটা আজই চুকিয়ে দিয়েছে প্রীতিম। অণিমা সবার থেকে আলাদা। প্রীতিমও দেখেছে। অহঙ্কারের মধ্যে দিয়েই ওরা কাছে এসেছিল। মেয়েটা হ্যাংলা নয়।

প্রীতিম বলে,—"অণিমা, তুমি আমার ইতিহাস জানো? তোমাদের বিদ্বান, সভ্য সমাজের বাইরের মানুষ আমি। তুমি আমায় নিয়ে ঘর বাঁধতে যেও না। তোমায় বন্ধুত্ব আমি স্বীকার করেছি।"

—দু'ঘণ্টাতেও আর নড়চড় হোল না। অণিমা চলে গেছে। সন্ধ্যাটা বড় মিষ্টি কেটেছে প্রীতিমের। স্বচ্ছ, উষ্ণ সান্নিধ্য অণিমার। অনেকগুলো সিগারেট পুড়িয়ে শুতে যায় ও।

ব্যবসাও আগুনের মত। ঠিক মত যাওয়ার যোগ থাকলে সর্ব্বগ্রাসী হতে বাধা নেই। প্রীতিমের কারবারও বেড়ে চলে। এখন আর ওর বড় অপেক্ষা রাখে না। কানের চুলে সাদা দাগ পড়েছে। ভেতরের উগ্র আক্রোশটা যেন শিথিল হ'য়ে আসছে। আকাশের মিষ্টি নীল রং—শিমুল শিরীষ, অশোক, পলাশের—গালের হোরিখেলা। একটা কষ্ট মোচর দেয় অসাবধানে। একটা ক্ষোভ ক্ষুধা, পাথর চাপা বিছের মতো নড়ে ওঠে। মদের বোতল আঁকড়ে ধরে মাতাল কাঁদে। প্রীতিম আরও কাজে ডুবে যায়। নেশায় সাধ্য সাধনা করে। নতুন নতুন কাজ, আইডিয়ার পিছনে তাড়া করে। নিজের পিঠে নিজেই চাবুক লাগায়। রক্ত ঝরে। লাল রং-এ নেশা জমে ওঠে। যুদ্ধের ঘোড়ার মত প্রীতিম ছোটে।

তারপর খাতাটা খানিক অস্পষ্ট। শেষের পাতাকটা আবার উদ্ধার করা যায়—। দুটো ভাঁজ করা চিঠি খাতার ভাঁজ থেকে খুলে পড়ে। কালিটা পুরোনো। ভজুর হয়ে গেছে। প্রীতিমের নিজের কথাতেই ভুলে দিই।

—পিছনে তাকায় প্রীতিম, অনেকদূর পার হয়ে এসেছি। স্বাস্থ্য এখনও অটুট—দেখলেও মনে হয় না—তবু পঁয়ষট্টি বছর বয়সটা বয়সই। ওর মত যারা অনেক টাকার মালিক—তারা শেষ জীবনে—সমাজ মানুষের সেবা করে। প্রায়শ্চিত্ত করে। সমাজও কোনদিন স্বীকার করেনি। মানুষ বলে কোন গোষ্ঠি চোখে পড়েনি। কার সেবা—করবো? অথচ এবার ছুটি চায়। অনেকদিন হোল।

অনিমা বলেছিল—সে আজ কত বছর হয়ে গেল—। শেষ জীবনটা বাইরের কাজ দিয়ে ভরা যায় না। তুমি না চাইলেও তলিয়ে যেতেই হবে। অর্থের ভার নামান কঠিন। ওর প্রস্তুতি ভয়ানক।

কি জানি! অনিমা আজ থাকলে ভালো হোতো। গোটা শৈশবটা সমুদ্র মন্থনে চলে গেছে। সমুদ্রই ত'। জীবনের গ্লানি ক্লেদ—নীল বিষ সমুদ্র। যৌবনের দীর্ঘ দিন—ঘূর্ণী ঝড়ের মতো—ভয়, অন্যায়, অনিষ্ট। কত বিক্ষত হ'য়ে গেছে। রক্তে স্নান করে—তন্ত্রের সাধনা। কি অকুণ্ঠ নেশা! আমি হারবো না! এমন আসুরিক দম্ভ কোথাও কি আর আছে! এই মন্থন! কি উঠলো— অমৃত না হলাহল। প্রীতিম ভাবে। মাথার বিরল চুলের মাঝে আঙুলের জাল বোনে। অনেক—অনেকক্ষণ।

আসুরিক শরীরও শ্লথ হয়। কাক ওঠার বহু আগে প্রীতিমের ঘুম ভাঙে, শহরের মাথা ছাড়িয়ে সবে সূর্য্য উঁকি দিত। তখনই প্রীতিমের পিঠের ঝোলা আধখানা ফুলে উঠেছে। ঘুম এখনও ভাঙে ভোরের আগে। শরীরে আলস্য। মনের পথচারী পরিক্রমা—অতীতের ফেলে আসা দিন।

কেও বলে না,—ও নিজেই অকারণে হিসেব মিলোয়। জীবনের খোলা খাতা সামনে পড়ে থাকে। পাতাগুলো লেখায় ভর্তি হিজিবিজি—পড়তে পারে না প্রীতিম। পুরু চশমার কাচ আময় দিয়ে ঘষে। বৃথা—। দোষ কাচের নয়—চোখে দৃষ্টি নেই।

দুদিন আগে নিরুপমার চিঠি এসেছে। প্রীতিমের জন্য আজও ওর মনটা সবুজ হ'য়ে আছে। ছেলে বিদেশে। মেয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। নিরুপমা একা। অনেকদিক একা। প্রবীর চলে গেছে—সেও দশ বছর

হ'য়ে গেল। ও আসতে চায়। প্রীতিমের মতই সময় ওর বুকে ভ'রে হয়ে ওঠে। তবু ছেলেমেয়ে। ওরা বড় অবুঝ—স্বার্থপর। নিরুপমা লিখেছে —ওর রক্তাক্ত হৃদয় সেকলে বাঁধা। প্রীতিম যেন ক্ষমা করে। ক্ষমা—? প্রীতিম পারে না। রাতে শোবার আগে ভোরে ঘুম ভেঙে—প্রীতিম প্রার্থনা করে। ভেতরটা জ্বলে যায়—দিনে, বিশ্রামের মাঝে—রাতের দুঃস্বপ্নে। শহর—পৃথিবী—আলো গাছের মাথায় লাল ফুলের মুকুট—চিতার মত জ্বলে। ওর ভেতরে আগ্নেয়গিরি নেভে না। লাভায়—শিশির, স্নেহ, হাসনাহানা জ্বলে যায়। রুক্ষ—পিঙ্গল—অঙ্গার ভস্মীভূত। লাভাই ত! তিলে তিলে জীবনটা ক্ষ'য়ে গেছে। কটা রুটির পেছনে। আগুনের ভেতর দিয়ে হেঁটে এলো সারাটা জীবন। স্নেহ, করুণা, ক্ষমার কোনদিন পরিচয় পেলো না। জীবনটা মরুভূমি হ'য়ে গেল।

টাকার অঙ্কটা ক্রমে দীর্ঘ থেকে আরও দীর্ঘ হোল। অতিকায়—সরীসৃপ। ওর লেজটা দেখা যায় না আর। প্রীতিম পুরু চশমার কাঁচ মোছে। বৃথা—অস্বচ্ছ চোখ—উদ্‌ভ্রান্ত মন।

উন্মাদের মত সঞ্চয় করেছে। মুক্তির পথ—জানেনা। অভিমন্যু নির্গমনের পথ হারিয়েছে। ওর রক্ত—রক্ত কেন ধ্বংসের বীজ হয়ে চরাচর ছেয়ে ফেলে না। হাসি, আলো, প্রীতি—ও মুছে দিতে চায়—সংসারের বুক থেকে। ক্রমাগত প্রীতিম পায়চারী করে। পুড়ে খাক্ হয়ে যায়। বিশ্বপ্রকৃতি অক্ষত—নিষ্করুণ—পথ চলে।

অনেকে দেখেছে। পিঠে থলি—দেহটা সামনে ঝুঁকে পরে—মানুষটি ময়লার স্তূপে—শহরের আনাচে শহরতলিতে ঘুরে বেড়ায়। ইশারায় ডাকে ছেলেটিকে —থলি পিঠে শিক হাতে—ওরই অর্ধশতাব্দী আগেকার প্রেতাত্মা। পিঠের ঝোলা থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে ওর হাতে দেয়—। "তোমার ছোট বোন নাই ত?—মা?" ছেলেটি ঘাড় নাড়ে। পাঁচটাকা হাতে তুলে দিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে। আশীর্বাদ কি! আগুনের বেড়া থেকে বাঁচান যায় কি? তার-পর চলে যায়। ছেলেটা অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে।

—এমনি—প্রতিদিন—। প্রথম ট্রামটি যখন ডিপো ছাড়ে শেষ রাতে। ভাঙা তবল ভেকার ধোঁকে রাত্রির দ্বিতীয় যামে। মানুষটি পথ চলে। ময়লা—আস্তাকুঁড়—হোটেলের পেছনে—বস্তির পাশে। টালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার—

কোথায় কখন ওকে দেখা যাবে—কেও জানে না। পুরু চশমার ভেতর চেয়ে থাকে। পিঠটা নেমে গেছে—বয়স আর বোঝাটা ওকে পিষে ফেলে—।

—ক্রমাগত হাত ভরে ঝোলায়। পাঁচটি টাকা উঠে আসে। এক প্রশ্ন—"তোমার ছোট বোন নেই ত?—মা? তারপর আরও পাঁচটি টাকা হাতে দিয়ে বিড়বিড় করে। চলে যায়—ফিরেও তাকায় না। অতীত বড় ভয়াবহ। ওই দক্ষিণের দরজায় চোখ জলে যায়—বুক পুড়ে যায়।

অনেক লোক জড় হ'য়ে গেছে। একটা বুড়ো আঁস্তাকুড়ের কাছে পড়ে আছে। পাশে লাঠিটা—আর একটা বড়সর থলি। চোখে পুরু চশমা। মুখখানা অদ্ভুত। ক্লেশ আর সমৃদ্ধি পাশাপাশি স্থির হয়ে আছে। পাশেই দুটো নীল মাছি ব'সে আছে। মানুষটা মরে গেছে।

—ভীড় ঠেলে সার্জেন এগিয়ে আসে। থলির ভেতর শুধু শুধু পাঁচ টাকার বাণ্ডিল—অনেক—থরে থরে।

১৩০৫০ টাকা। পকেটে ময়লা মুছে-যাওয়া একটা ছবি। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। একটা ছোট্ট খাতা—অপিষ্ট। গোটা পঁচিশ পাতা—কাঁচা হাতে লেখা। কে এই প্রীতিম! কবি কাহিনী? ওই বৃদ্ধের আত্মজীবনী কি? পুলিশী ঝঞ্ঝাটের ফাঁকে খাতাটি আমার হাতে পরে যায়। সুরু বা শেষ কিছুই নেই। কোন এক চরছাড়া জীবনের ক'টি ছেঁড়াপাতা।

সে

দিলীপ ঘোষ

প্রথম দিন এসেছিল সাদা জমিতে ছোট ছোট রঙিন বুটি দেওয়া শাড়ি পরে। দ্বিতীয় দিন ছাপা শাড়ি, তৃতীয় দিনে রঙীন ডুরে।

প্রচার দপ্তরের কাজ করি। নানা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। অনেকেই আসেন কাগজে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্যে। বছরের শেষে বাজেটে টাকা না থাকায় প্রথম দিনেই মেয়েটিকে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা জানিয়েছিলাম। তবুও আরও দুদিন এসেছিল। তৃতীয় দিনে খানিকটা বিরক্ত হয়েই এমন সব কথা বলেছিলাম, যার ফলে সে চতুর্থ দিন আসার কোন চেষ্টা করেনি।

এটা তো কোন ঘটনা নয়। এ ব্যাপারটা তাই মনে রাখারও কোন কারণ নেই। কিন্তু মাস ছয়েক পর এটা যেন একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়াল এবং আমার বিস্মৃতির কালো গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে সাংঘাতিক ভাবে ছোবল মারল।

ধর্মতলায় ট্রামে উঠেছি। বাব কলেজ স্ট্রীট বই পাড়া। ট্রামের সীটগুলো প্রায় ভর্তি থাকলেও দাঁড়াবার জায়গা ছিল যথেষ্ট। তাই ভাল ভাবেই দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে বসা মেয়েটি স্মিত হাস্যে আমার দিকে তাকালো। তারপর একটু সরে পাশে বসতে সাহায্য করল। অনেক মেয়েই সম্ভব হলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষকে বসতে জায়গা করে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে। কিন্তু ঐ স্মিত হাসি পরিচিত ছাড়া কারও পক্ষে ওরকম ভদ্রতা বোধ হয় সম্ভব নয়। আমি আমার পরিচিতজনের সকলকে মনে করার চেষ্টা করলাম। মেয়েটি নিজেই আমায় সাহায্য করল—চিনতে পারছেন? আপনার কাছে এক সময় বিজ্ঞাপনের জন্য গিয়েছিলাম।

সেই স্বল্প পরিচয়টুকু স্মরণ করে আমি আলাপা হয়ে উঠতে চেষ্টা করি। দু-এক কথার পর নেহাতই এক মামুলি প্রশ্ন—বিয়ে করলেন কবে?

—তা প্রায় পাঁচ বছর।

—সেদিন কিন্তু আপনাকে দেখে ঠিক বুঝতে পারিনি। মেয়েটি বিষন্ন হাসল —হ্যাঁ, বাঙালী মেয়ে হয়েও তখন শাঁখা সিঁদুরকে সরিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম কুমারী হলে বুঝি ভাল সেল্‌স গার্ল হওয়া যায়। আর তা হওয়া তখন

আমার খুব দরকার ছিল।

ট্রামখানা ইউনিভার্সিটি ছাড়াতেই আমি ওঠার প্রস্তুতি নিই। ওর সৌজন্য-বোধের জন্য আমারও যেন সামান্য উপকার করতে ইচ্ছে হল। বললাম—আসবেন একদিন। নতুন বাজেট থেকে আপনাকে একটা বিজ্ঞাপন দেবার চেষ্টা করব।

মেয়েটি করুণ ভাবে হাসল—না, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

—চাকরি পেয়েছেন বুঝি?

মেয়েটির স্বর অনেক নিচু—একটা স্কুল মাষ্টারী তো অনেক দিন থেকেই করি। কিছু বাড়তি টাকার দরকার হয়েছিল। তাই ঐ বিজ্ঞাপন যোগাড়ের কাজটা নিয়েছিলাম। এখন আর তার দরকার নেই।

—দরকার নেই বলার মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ছিল। কিছুক্ষণ পর সেই দীর্ঘশ্বাস সহজ ভাষায় আমার বুকে আঘাত করল—আমার একমাত্র মেয়েটির থ্যালাসেমিয়া হয়েছিল। মাসে দুবোতল করে রক্ত দিতে হ'ত। এখন সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

Phone : 34-7957

With Best Compliments—

DEEP PRINTER

9. Peary mohon Paul Lane
Calcutta—7

কর্ণেল সাহেবের স্ত্রী

তৃপ্তি বসু

কাঁধে হাত পড়তেই ফিরে তাকালেন ডাঃ মিত্র। সেই লোকটি!

দু'টো টেব্‌লের ওপাশ থেকে অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছে তাঁকে। কোন্ এক কর্ণেল সাহেব। বারবার ওর তাকান দেখে ডাক্তার মিত্রও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন মনে মনে।···ফেসের সাইড ভিউটা···ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গীটুকু কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ ওই সামান্য ইঙ্গিতটুকু ধরে কোন একজন পরিচিত মানুষের পুরোপুরি স্ট্রাক্‌চারটা কিছুতেই স্মৃতির পটে ছায়া ফেলছে না। আর ফেলছে না বলেই অস্বস্তি। এতক্ষণে একেবারে বিব্রতভাব দেখে হাসল—

একেবারেই চেনা যায় না?

চোখে চোখে মুহূর্ত তাকিয়ে থাকা। তারপরই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ডাঃ মিত্র—

অতীশ।

অতীশ।

আশ্চর্য তুই!

আশ্চর্য আমি। কিন্তু হ্যাঁরে এতই কি বদলে গেছি যে একেবারে চিনতেই পারলি না?

বদলে গেছিস, অনেক রকম বদলে গেছিস বিশ্বাস কর। মিলিটারীর কঠিন নিয়মে বাঁধা পড়েও বডিটাকে বেশ হেভীই বানিয়ে তুলেছিস। কালো কুচকুচে সুন্দর চুলগুলোর বদলে মাথার সামনের দিকে নির্ভেজাল প্রে-গ্রাউণ্ড। তার ওপর ওই জবরদস্ত মিলিটারী গোঁফ! চেনা যায়? বল্ তুই? তাছাড়া ···তোকে ত এখানে আশাও করি নি।

আরে, আমিই কি তোকে আশা করেছি? তবে হ্যাঁ সময়-সমুদ্রে দীর্ঘ পাড়ি দিয়েও তোর চেহারার কিন্তু একটুকুও পরিবর্তন হয় নি। তেমনি স্লেপ তেমনি স্মার্ট, তেমনি ছিপছিপেই আছিস। বাড়তি মেদও যেমন অর্জন করিস নি, অপব্যয়ও হয়নি মজুদ সঞ্চয়ের। তাই ত তোকে চট্ করে চিনে উঠতে পারলাম।

হেসে ফেললেন ডাঃ মিত্র, বললেন—

তুইও কিন্তু একদিক দিয়ে ঠিক তেমনিই আছিস। ঠিক আগের মতই মজা করে কথা বলিস।

আর তুই? তুই ও কি শুধু চেহারাটাকেই ধরে রাখতে পেরেছিস? স্বভাবটাকে নয়? কথায় কথায় আর কবিতা আওড়াস না? হাসিস না হা-হা করে? আমরা ত তাই তোকে সার্থকনামা বলতাম। বলতাম তোর নাম শুধু আনন্দ মিত্র না হয়ে হওয়া উচিত ছিল আনন্দময় মিত্র। তুই কি সেদিক দিয়ে বদলে গেছিস বলতে চাস?

কি জানি—ডাঃ মিত্র ছোট্ট করে জবাব দিলেন।

কর্ণেল মজুমদার মানে অতীশ জিজ্ঞেস করলেন, কদ্দিন আছিস এখানে।

বছর কুড়ি।

বছর কুড়ি। একেবারে পেকড় গেড়ে বসে গেছিস বল্? ··হাসছিস যে? দেশের দিকে ফেরা টেরার ইচ্ছে আছে নাকি এই লক্ষ্ণৌ শহরটাকেই ভালবেসে ফেলেছিস্? বাড়ী ফাড়ী ফেঁদে বসিস নিত?

প্রতিটি লাইন আস্তে আস্তে থেমে থেমে দু'বার করে উচ্চারণ করে ডাক্তার মিত্র জবাব দিলেন—

"লখনউ ফিদায়ে মুঝ পর মঁয় ফিদায়ে লখনউ পর।
ক্যা তাকৎ হৈ আসমাঁ কী জো ছোড়ায়ে মুঝে লখনউ॥

ইয়া···এইত, এইত তুই আমাদের সেই পুরণো পরিচিত আনন্দ। কিন্তু বন্ধু দীর্ঘ বিশ বছরে কিঞ্চিত উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। বাংলা কবিতা কণা ছেড়ে উর্দু শায়রী আওড়াচ্ছ।

তার মানে ভবিষ্যতেও নট্ নড়ন-চড়ন?

ভবিষ্যতের কথা এখনই বলা যায়?

যায় না?

না যায় না—দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন ডাঃ মিত্র।

দীর্ঘদিন ধরে ঘনিষ্ঠভাবে চেনা, জানা জীবনের অভ্যস্ত ছকটা যখন হঠাৎ এক নিমেষেই পাল্টে যায় তখন কোথাও একটা আশ্বাসের আশ্রয় চায় মন। সেই ফাঁকটুকু দিয়েই নিঃশব্দ চরণে বিশ্বাস এসে বুকের ভেতরে বাসা বাঁধে। আর তখনই বোঝা যায় যে স্ব-ইচ্ছায় কিছুই এখানে হবার নেই। এক অদৃশ্য ডিক্টেটরের অলক্ষ্য নির্দেশকেই নির্ভুল গতিতে অনুসরণ করে চলেছে জীবন।

সে বড় অবরদস্ত ডিক্টেটর। যতটুকু সে দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে শত আর্তনাদেও তার এতটুকু বেশী তুই পেতে পারিস না, কিছুতেই না।

বাল্যবন্ধুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলল অতীশ। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে বাইরের সেই অদ্ভুত আমলকী গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত, কারণ সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার নিষ্পত্র গাছটার একটি মাত্র ডালে শুধু একজোড়া আমলকী ফল অল্প অল্প হাওয়ায় দুলছে।···সেই সেবার ট্রেনিং শেষে ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলেন কর্ণেল মজুমদার। তখন একটা কানাঘুষো শুনেছিলেন অনিন্দ্য বিষয়ে। কিন্তু বন্ধুকে এত বেশী ভালবাসতেন যে সে কানকথাকে প্রশ্রয় দেননি। অবশ্য তারপর দেখাও হয় নি আর। আজ এতকাল পরে ঠিক সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল। অথচ ইচ্ছে হলেও জিজ্ঞেস করে উঠতে পারলেন না।

পরিবর্তে—

শোন্, আমার কয়িরাপ্পা রোডের বাংলোয় আসবি কাল বিকেলে মিসেসকে নিয়ে। আমি ফ্রী থাকব।

মিসেস পাব কোথায় ?

কেন ? এখানে নেই ?

কোনখানেই নেই !

আহা, এই বয়সেই স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে। দুঃখিত হলেন অতীশ। কি আর করা যাবে। এই একটা জায়গায় মানুষ বুঝি একেবারেই নিরুপায়। আর এই আঘাতেই বোধহয় আনন্দ ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। একটু চুপ করে থেকে জানতে চাইলেন—

ছেলেপুলে কটি ?

একটি—ছেলে। আস্তে করে জবাব দিলেন ডাঃ মিত্র।

শুভ্, বয়স কত।

তা প্রায় কুড়ি বছর হতে চলল।

পড়াশোনা ?

মেডিক্যাল কলেজে, থার্ড ইয়ারে।

বাঃ সুন্দর। ডাক্তারের ছেলে ডাক্তারই হবে। শুনতেও কত ভাল লাগে বল্·····

হঠাৎ চুপ করে গেল অতীশ। কেমন যেন বিষণ্ণ দেখাল। পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন ডাঃ মিত্র। প্রশ্ন করলেন—

কি হল ?

কিছু না। বিষণ্ণ হাসল অতীশ।

বহুকাল পরে বন্ধুসম্মিলন। যে বয়সে বন্ধুত্ব সে বয়সে পরস্পরের অন্তরের অলিগলির সন্ধান ছিল পরস্পরের মনের আয়নায়। উল্টো হলেও সঠিক ছায়াটুকুকে ধরা ছোঁয়া যেত। আজ সে অন্তরের ভাগীদার এসে গেছে। তা ছাড়া তাঁর অংশের আগলও রয়েছে বহুকাল রুদ্ধ। আজ তাকে ধাক্কা দিয়ে খুলতে গেলে মুখে চোখে কিছুটা আবর্জনা উড়ে আসারই সম্ভাবনা। কিন্তু না। বন্ধুর পরের কথায় বুঝলেন তাঁর সে ধারণা ভুল। অন্ততঃ তাঁর সম্বন্ধে অতীশের মনের কোন পরিবর্তন হয় নি।

আমার মিসেস অদ্ভুত। মায়ের জাত হয়েও ছেলেপুলে একেবারেই পছন্দ করে না। অথচ আমি নিজে এত ভালবাসি···কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিও এল না ঘরে। ওর জেদই বজায় রইল।

অল্প ইতস্ততঃ করে ডাঃ মিত্র বললেন —

বজায় রাখতে দিলি কেন ?

কি করব ? সেই শর্তেই ত বিয়ে হয়েছিল।

সে কি ?

হ্যাঁ, শর্ত ছিল কোনদিন যদি সন্তানের জন্যে জবরদস্তি করি তার ফল হবে বিচ্ছেদ। ওকে পাগলের মত ভালবেসে ফেলেছিলাম আর ভেবেছিলাম যে কন্‌জারভেটিভ ফ্যামিলির পিউরিটান কুমারী মেয়ের বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে এ এক স্বাভাবিক ভীতি বা অনীহা···যদিও এমন কেস রোজার তবু মেলে ত। কিন্তু সে যে এত দীর্ঘদিন, প্রায় সারাজীবনই, স্থায়ী হবে তা বুঝি নি।

রুমাকে জানিস ত, আমার বোন। যেচারা দশ বছরে চারটেকে নিয়ে হিমসিম্ খাচ্ছে। আমিই লিখেছিলাম দু'দিন এসে জিরোতে। আমার মিসেস এমনিতে এত অতিথিবৎসল কিন্তু ওই এক বাতিক। ছেলেপুলে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাই নিয়ে ছোটখাট অসন্তোষ, মন কষাকষি। শেষপর্যন্ত রাগ করেই রুমাটা ফিরে গেল। আমি ভাই হয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে রইলাম। কিছুই করে উঠতে পারলাম না।·····রাস্তায় ভিখিরীর বাচ্চা-গুলোকে দেখলে রেগে অস্থির হয়। বল্ রাস্তা কি আমার শ্বশুরের কেনা ? অনাথ আশ্রমের দুটো ছোট ছেলে চাঁদা চাইতে এসেছিল। কিছু দিতে ত দিলই না উপরন্তু সে এক সিন্‌ই করে বসেছিল সেদিন।

আশ্চর্য !

সত্যিই আশ্চর্য। কি আর করব বল্, বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছি। যাক্ কাল বিকেলে আসিস নিশ্চয়ই।

আজ দুদিন কোন কাজেই আর ঠিকমত মন লাগিয়ে উঠতে পারছেন না ডাঃ মিত্র। অতীশের বাংলোয় শর্মিলাকে দেখার পর থেকেই কেমন এক শঙ্কা জেগেছে মনে। এই বয়সে আবার, আবারও কি উদ্বাস্তু হতে হবে তাঁকে ?

শর্মিলা এই শহরে থাকবে অথচ তাঁর কাছে আসবে না এ হতে পারে না। আর শর্মিলার তাঁর কাছে আসা মানেই অন্তহীন দুঃখের গহ্বরে অনন্ত নিমজ্জন।

এক হতে পারে যদি শর্মিলার সঙ্গে পুনঃ সাক্ষাতের আগেই আবারও হারিয়ে যেতে পারেন অন্য কোন শহরের অপরিচিত অনারণ্যে। কিন্তু বিশ বছর আগে অনায়াসেই যা সম্ভব হয়েছিল আজ তা রীতিমত আয়াস সাধ্য। সেদিন শুধু নিজের বিবেচনা মতই কাজ করে গেছলেন অন্য কারোধার ধারেননি। আজ আর কারোর কাছে না হোক সেদিনের সেই অবোধ শিশুর কাছ থেকে রেহাই পাবেন কি করে ? বোধে, বুদ্ধিতে আজ সে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে ? কি করা যায়.....একবার হার হয়েছে তাঁর শর্মিলার কাছে আজ আর কিছুতেই হেরে যেতে পারেন না। কিছুতেই না।

তীব্রভাবে কলিংবেল বেজে উঠল।

কিছুক্ষণ পর পর দু' তিনবার বাজার পরই হঠাৎ ডাঃ মিত্রর খেয়াল হল যে বাড়ীতে তিনি ছাড়া আর কেউই নেই। আয়া রান্না সেরে চলে গেছে। চাকরটা এ বেলা সিনেমা দেখার ছুটি নিয়েছে। ছেলে বেরিয়েছে কোথাও।

কাজেই উঠতে হল।

দরজা খুলেই দু'পা পিছিয়ে এলেন। তাঁরই একটু আগের চিন্তা মূর্তি ধরে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

ঘরে এসে বসার পর দু'জনেই একটুকাল চুপ করে রইলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন ডাঃ মিত্র—

বাড়ী চিনলে কি করে ?

অস্বস্তি গোপন করে সহজ হবার চেষ্টায় সামান্য হাসলেন শর্মিলা। তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন—

দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাক্‌টিশ করা কোন প্রফেশনাল ম্যানের ঠিকানা খুঁজে বার করা কোন শহরেই অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না। মার্কেটিং-এর বাহানায় আমিনা-

বাদে এসেছিলাম আসল উদ্দেশ্য ছিল তোমার এখানে আসা। সেই দিনই শুনেছিলাম আমিনাবাদের কাছাকাছি কোথাও থাক। ড্রাইভারকে বলেছি কয়েকটা দোকান ঘুরতে হবে। সে যেন ঘন্টাখানেক পরে ফলের দোকানের সামনে কার পার্কিং এ আমার জন্য অপেক্ষা করে। সেই এক ঘন্টার আধঘন্টাই বেরিয়ে গেল তোমার বাড়ী খুঁজে বের করতে। আর মাত্র আধঘন্টা সময় আছে আমার হাতে। ওরই ভেতর কিছু কেনাকাটাও সারতে হবে নইলে শূণ্য হাত দেখলে ড্রাইভার সন্দেহ করতে পারে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলার পরিশ্রমেই বুঝি শর্মিলা একটু হাঁপিয়ে উঠলেন। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

ডাঃ মিত্র একটুকাল চুপ করে রইলেন। তারপর আস্তে বললেন—আমার কাছে কি মনে করে?

একটু ইতস্তত: করলেন শর্মিলা। তারপর একবার ঢোক গিলে চাপাস্বরে প্রশ্ন করলেন—

সে কোথায়?

কে?

তোমার—মানে—আমার ছেলে?

স্তব্ধ হয়ে গেলেন ডাঃ মিত্র। প্রত্যাশিত প্রশ্ন। তবু সময়ও বুঝি একটুকাল থেমে থাকল ডাঃ মিত্রের সংগে। তারপর নৈঃশব্দ ভংগ হল—

কে বললে সে আমার কাছে আছে? কি করে জানলে?

কেউ নয়। প্রাণের দায়ে জেনেছি। ক্রমশঃ যতদিন গেছে অধীর হয়েছি অস্থির হয়ে উঠেছি, খুঁজে খুঁজে ফিরেছি গোপনে গোপনে। শেষে হদিশ মিলল। ছুটে গেলাম সেই অনাথ আশ্রমে। সেখানেও পেলাম না। শুধু জানলাম কোন একজন এসে নিয়ে গেছে। আশ্রমের রেজিষ্টারে স্পষ্ট তোমার হাতের লেখায় তোমার নিজের নাম দেখলাম। সেই থেকে খুঁজে বেড়িয়েছি তোমাকে। তোমার বাড়ীর লোকেরাও সন্ধান দিতে পারল না। তাদের ধারণা তুমি চলে গেছ একেবারে ভারতের বাইরে আর সেখানেই ঘর-সংসার পেতে আরামে বসবাস করছ। আমিও ইদানীং নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে শুরু করেছিলাম যে যেখানেই থাক তোমার কাছেই আছে, তার নিজের জায়গাতে নিজের অধিকারেই আছে। আমার ভাবনা করার কিছু নেই। কিন্তু সেদিন তোমায় দেখার পর থেকে কিছুতেই আর নিজেকে সামলাতে পারছি না…কোথায় সে?

বাড়ী নেই। থাকলেও তোমার সংগে দেখা হোত না। সে জানে শিশুকালেই তার মা মারা গেছে। আজ এতকাল পরে সেই মাকেই চোখের সামনে দেখলে যে কি বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে তা' তুমি কল্পনাও করে উঠতে পারবে না। দেখ শর্মিলা সংসারে কিছু সত্য আছে যা' গোপন থাকলেই সুন্দর। তাই তোমায় অনুরোধ করছি খুঁচিয়ে আলোয় এনে তার বীভৎস ঘা গুলো আর স্পষ্ট করে তুলো না। তা'তে তোমারও কোন লাভ হবে না, আমারও নয়।

একটু চুপ করে থেকে শর্মিলা বললেন—

শুনলাম বৌ মারা গেছে? বিয়ে করেছিলে কবে?

বিয়ে করি নি।

তাহলে?

বিয়ের আগেই মরেছে। অতীশ সোজা মানুষ। অতশত বুঝবে না। তাই মারা গেছে এইটুকুই বলেছি—না, ঠিক তাও বলি নি যা' বলেছি তা'তে ও নিজেই অনুমান করে নিয়েছে যে আমি অল্পবয়সেই বিপত্নীক হয়েছি।··· যাই হোক্ তার আসার সময় হোল। তুমি এবার ওঠ। আমি চাই না যে তার সংগে তোমার দেখা হয়।

একবার—একটিবার। অনুরোধে ভেঙে পড়লেন শর্মিলা—শুধু একটিবার তাকে দেখেই চলে যাব।

না। যে মা নিজের লজ্জা ঢাকতে সন্তান জন্মের আগেই তা'কে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিতে সম্মত হয় সে মায়ের অধিকার নেই সন্তানের মুখ দেখার। তাছাড়া তাকে বৈধ করে নেওয়ার জন্যে বিয়ের প্রস্তাবও ত দিয়েছিলাম তা'তেও রাজী হওনি।

আমি যে—আমি যে—মনে প্রাণে তোমায় ঘৃণা করতাম।

জানি, আমি গরীব ছিলাম বলে। অথচ সেই মনে-প্রাণে ঘেন্না করা লোকটাকেও বারে বারে চেষ্টা করে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলতে তোমার দ্বিধা হয় নি।

আমার রাগ হত। সবাই যখন আমার রূপের, আমার গুণের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠত তখন একমাত্র তুমিই উপেক্ষায় নীরব থাকতে।

না, উপেক্ষায় নয় গভীর ভালবাসায়। শর্মিলা আমার চেয়ে ভাল তোমায় কেউ কোনদিন বাসে নি। আমার মত উপায়হীন ছিল না কেউ।

তোমার অভিভাবকের অনুগ্রহেই আমার যা' কিছু উন্নতি। আমার মত সামর্থ্যহীনের থাকা, খাওয়া পড়াশুনা সবই তাঁর দয়ায়। সেই দয়ালু আশ্রয়-দাতার নিশ্চিন্ত উঁচু ডাল থেকে তাঁরই প্রিয় ফলটিকে পেড়ে এনে নিজের ভোগে লাগাব এ মূর্খামি আমার আসে নি। তাই আমি চুপ করে থাকতাম। নিঃশব্দে সংযত রাখতাম নিজেকে। অথচ তুমি···শেষ পর্যন্ত সেই নির্জন সন্ধ্যায় তুমিই জয়ী হলে। আমি হারিয়ে ফেললাম নিজেকে।

কিছুদিন পরেই এতবড় পৃথিবীতে তোমার আক্রোশের একমাত্র পাত্র হয়ে উঠলাম আমিই। কি না করলে! দুর্নামের ডালি মাথায় নিয়ে আশ্রয়চ্যুত হতে হল। পথে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু তোমাকে আমি নজর ছাড়া করিনি। কারণ তুমি যাইই হও তোমার গর্ভে রয়েছে আমারই সন্তান। সত্যি কথা বলতে কি ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার আশংকা ছিল। তাই অনাথ আশ্রমের সন্ধান পেতে তোমার মত আমার দেরী হয় নি। ওকে বুকে নিয়েই এই দূরদেশে পাড়ি দিয়েছিলাম। এখানে সবাই জানে যে এ হতে গিয়েই এর মা জগৎ ছেড়ে চলে গেছে।···সব ত শুনলে। তোমায় আবারও অনুরোধ করছি শর্মিলা এবার তুমি যাও। আর এখানে থেক না।

তা' হয় না আনন্দ। এতকাল পরে খুঁজে পেয়েও একটিবার ভাল করে না দেখে ফিরে যেতে পারব না।—সজল চোখে শর্মিলা বললেন।

কিছুতেই নয়, কোনমতেই তা' সম্ভব নয়—
কঠিন স্বরে জবাব দিলেন ডাঃ মিত্র!

চোখে রুমাল চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন শর্মিলা।

ঊনি কে বাবা? কাঁদছেন কেন?

চমকে মুখ তুললেন উভয়েই।

একহাতে টেনিস র‍্যাকেট অন্য হাতে কয়েকটা বই নিয়ে খোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

তীরের মত উঠে দাঁড়িয়ে উন্মাদিনীর মতো দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন শর্মিলা·····

অকস্মাৎ ডাঃ মিত্রের স্বর শোনা গেল—

উনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, কর্ণেল সাহেবের স্ত্রী। ওঁর একমাত্র ছেলে সম্প্রতি মারা গেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ডাঃ মিত্রের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন শর্মিলা। মুহূর্তকাল চোখে চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপরই মুখ ফিরিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

কবরখানা

শিশির গুহ

শেষ বিকেলের আলোয় সমস্ত জায়গাটা সোনা রংয়ে মাখানো ছিল। কেমন একটা নরম নরম মোলায়েম ভাব ছিল বাতাসে। কৃষ্ণচূড়ার ডগায় ডগায় উল্লাস। প্রাচীরের ওপর বসে পা দোলাতে দোলাতে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে দেখে গিয়েছিল রাজা, কিন্তু কি আশ্চর্য, এখন ঠিক ঠাহর করতে পারছেনা জায়গাটা।

এখন গভীর অন্ধকার। শিরশিরানী বাতাসের গায়েও যেন ভয়ের গন্ধ। গাছের পাতা নড়লে শব্দ শোনা যায়। এলোমেলো বিস্তর গাছ-গাছালির ভীড় এখানে। পা ফেলতেই শুকনো পাতার মচমচানী। আপনা আপনি পা থমকে দাঁড়ায়, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তবু থৈ থৈ কাজুলে অন্ধকারের মধ্যেও বেশ বোঝা যায় জায়গাটা কেন জানি আরো বেশী অন্ধকার। নিবু নিবু পিদিমের আলো জায়গাটাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। খাদিম থাকে ওখানে।

সারাদিন এখানকার খেদমৎ খাটতেই ব্যস্ত। লোকটা কেউ কেউ বলে সারারাত তিতির পাখির মত মৃতদেহের আশায় বসে বসে ঝিমোয় খাদিম, কিন্তু ঘুমোয় না। কেউ বলে ওর সমস্ত আপনজনকে এখানে ঘুম পাড়িয়ে পাহারা দেয় বুড়ো। বয়সের গাছ-পাথর নেই নিজের বয়সও নিজে জানে না। সাথী কালুয়া ফিস ফিস করে বকছিল রাজাকে—আবে তুই শালা একদম উল্লুক পাট্টা। চিন্‌হা দিয়ে গেলি তো জায়গাটা চিনতে পারছিস না কেন? যত মত খায় রাজা। বিরাট এলাকা জুড়ে এই কবরস্থান। দিনের আলোয় দেখে যা মনে হয়েছিল এখন যেন তার উল্টো পিঠ। পা টিপে টিপে এগোচ্ছিল দু'জনে।

এ তল্লাটের চারিদিকে ঘন বস্তি। এ্যাসিডের ঘরোয়া কারখানা। সবমিলে খক খক কাশির শব্দ আর কুকুরের চীৎকার। কেমন যেন দিশেহারা লাগছে রাজার। সত্য খোঁড়া হয়েছে এমন জায়গার খোঁজ করছিলও।

কালুয়া বিরক্তিতে ঠোঁট ওল্টাচ্ছিল বারবার—ধুৎ শালা, তুই একদম বুদ্ধু, তুর চোখের ডগাতে গোর দিয়ে গেল আর এখুন খুঁজে পেছিস না ইটা কেমুন

কথা। একটা হোঁচট খেয়ে কঁকিয়ে উঠলো রাজা। হাতের ছোট্ট কোদালটা ছিটকে পড়লো কোথায় যেন।

বাইরে একটা কুকুর আর্তনাদ করে উঠতেই আতঙ্কে রাজার বুকটা কেঁপে উঠলো মুহূর্তে। উবু হয়ে বসে হাতড়ে হাতড়ে কোদালটা খুঁজে নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলো রাজা। পা টিপে টিপে দাঁতে নিজের ঠোঁট কামড়ে প্রাচীরের কোন ঘেসে টান টান হয়ে দাঁড়াল সে। পাশ থেকে হিশহিশিয়ে উঠলো কালুয়া।

—ডোমের ঘরে জনম লিয়ে গোর চিনতে তুর ভুল হয় রে রাজা? ছিঃ ছিঃ। গোরের মাটি দেখে বুইলতে পারি বিটা ছেইলা না মিয়াছিলা

—চুপচুপ। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সাবধান করলো রাজা খাদিমের খড়মের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ঠক্ ঠক্ টক্ ঠক্।

কালুয়া রাজা বিদ্যুৎ গতিতে শুয়ে পড়লো মাটিতে। একটু পরে লতিয়ে লতিয়ে এগোতে লাগলো সাপের মত। না, খাদিমের পায়ের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না, বাতিটাও অস্পষ্ট। বুড়ো বোধ হয় বিছানায়।

খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল রাজা। জোরে জোরে বাতাসের গন্ধ নিতে চাইলো। তারপর পা দিয়ে বুঝলো ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। কালুয়া তড়িঘড়ি কোদাল দিয়ে মাটি সরাতে লাগলো তড়িৎ গতিতে। রাজার গা 'টা কেমন ছম ছম করছে, অন্ধকারে যেন শিরাশিরানী ভয়ের স্রোত।

কালুয়া জিভ দিয়ে চটাস্ করে শব্দ তুলে বললো—ইঃ শালা গর্ত কুইরেছে কতরে। হাতি পুতেছে নাকি? রাজা অন্ধকারের ভেতর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি করলো বোঝা গেল না।

এতক্ষণে কালুয়া গর্তের ভেতর পা ডুবিয়ে দিয়েছে।

— এট্ শরীর, শালা তার ভিতর সাত পল্লা কাপড়ের বাহার।

হিমশীতল একটা শরীরকে ছুঁয়ে ফেললো কালুয়া নিজের শরীর দিয়ে। ওর তর সইছিল না তড়িঘড়ি কাপড় খুলতে গিয়েই কেমন যেন বাঁধো বাঁধো লাগছে মনে হলো। ওপরের দিকে পা টানতেই কোথায় যেন আট্‌কে গেল পা 'টা। সেকি। ওর পা কি কেউ তবে টেনে ধরেছে? কথাটা মনে আসতেই কালুয়ার শরীর কেঁপে উঠলো থরথর করে। আরেকবার ওপর দিয়ে পা তুলতে চাইলো ও কিন্তু না। আট্‌কে গেছে। ভয়ে কেমন একটা গোঙানোর শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। শুয়ে পরে মাটি আঁকড়ে বার বার পা তোলার চেষ্টা করতে লাগলো কালুয়া। হঠাৎ সামনে দেখলো খাদিম দাঁড়িয়ে। পাকা

ধবধবে চুল, পায়ে খড়ম। সমস্ত এলাকা ঘুরে ঈশ্বরের মত ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভয়ার্ত কালুয়ার ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো, শব্দ শোনা গেল না। অন্ধকারের দিকে আরেকবার শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো সে। সমস্ত কবরখানা জুড়ে অসংখ্য উলঙ্গ বীভৎস শবগুলো উঠে দাঁড়িয়েছে। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসছে বুঝি। কালুয়া শেষবারের মতো চীৎকার দিয়ে রাজাকে খুঁজতে চাইল।

রাজা ততক্ষণে অন্ধকারের সমুদ্র সাঁতরে আলোর আকাঙ্খায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

With Best Compliments from :—

COOKME

Calcutta—700070

অন্তরঙ্গ

চন্দ্রচূড় সরকার

ট্রেন থেকে নেমে, চারদিকে তাকাতে তাকাতে ট্রেনটা ছেড়ে গেলে আরেকবার দেখে স্বস্তি পেল—নাঃ সব কিছুই নেমেছে, কিছু রয়ে যায়নি। খুব বেশী কিছু জিনিস নেই সঙ্গে, তবু-টুকটাক হাতের বইটা, সিগারেট প্যাকেট,—এর যে কোন একটাও থেকে যেতে পারত। ট্রেনটা ছেড়ে গেলে আসলে কোথাও যাওয়াটা-পৌঁছনোটা পুরো হয় যেন। অতঃপর এক কাপ চা। কিছুর একটা পরেই ঐ চা বা সিগারেট—'next item, water of India'

প্রথম দর্শনে জায়গাটা মন্দ লাগেনি। প্রায় যে কোন পশ্চিম বাংলার সংলগ্ন, বিহারের গ্রাম বা শহর। রিক্সা বাস ও ট্রেনের স্টেশন। শেয়ার টেম্পো ইয়ানীং মিনি বাস-স্কুটার-রিক্সা। এটা একটু ছোট স্টেশন, দিনে কয়েকটা মোটে বাস ও ট্রেন এ পথে যায়। অন্য কোন যানবাহন নেই। টী-স্টলে একই পান্সে চা, নিমকি, লাড্ডু, আলুর চপ ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায়না—পাঁউরুটি, টিফিন কেক। বাইরের দোকানে বেঞ্চিতে গুছিয়ে বসে কি-কি খেয়ে পেটটা আপাততঃ ভরাবে ঠিক করে। চাটা বলে দিয়েছে। এখন হিম কম, বসন্ত আসছে, যদিও প্রত্যক্ষ শীতকাল। রাত্রের জ্বালানো আগুনের ছাই কাছেই পড়ে আছে। কিছুটা কুয়াশা তবু আছে—এখন এই বেলা সকালে। তাছাড়া এখানে ওখানে উনুনে সকালের আঁচ পড়েছে। মাথা ও কান চাদরে ঢাকা দু-একজন এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। আবছা রোদ রাস্তার একটা অংশে পড়ে ছবিটায় যেন একটা উষ্ণ-জীবন্ত ছাপ দিয়েছে। কয়েকটা মুরগী, একটার সঙ্গে কয়েকটা ছানা, ব্যস্ত হয়ে ছাই গাদা ঘাঁটছে। সবল চেহারার উজ্জ্বল রংয়ের মোরগটা মাঝে মাঝে মাথা তুলে চারপাশদেখছে খুঁটে খাচ্ছে। তৃপ্ত খুশী খুশী ভাব। শীতের সকালে গরম চায়ের গ্লাসটা হাতে নিয়ে একটা আরাম ছড়িয়ে পরা অনুভব করা যায়। ভাবতে ভাল লাগে ঠিক এই মুহূর্তটাতে কেউ দৈনন্দিন-ক্লান্তির কথায় ব্যস্ত হয়ে নেই। ওসব যেন নেই-ই, এই শীতের সকালে শুধু সারা রাত্রের গাঢ় ঘুমের আরামের স্মৃতি-আমেজ কুয়াশার মত জড়িয়ে আছে—যতক্ষণ না রোদ ওঠে। গরম চায়ের মত সবকিছু যেন তৃপ্তি ও আরামের ব্যাপার।

'কোত্থেকে আসছেন'—পাশের লোকটি গুছিয়ে ব'সে অবধারিত প্রথম প্রশ্নটি করে। দেখেই বোঝা যায় কোথাও যাবার জন্তে এখানে আসেনি। মোটা সুতির চাদরে প্রায় সব ঢাকা। খোঁচা খোঁচা দাড়ি—বর্ণনা দেবার মত বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। শীত, শুকনো ধুলো মাড়িয়ে আসা পা দেখা যাচ্ছে ধুতি-চাদরের ফাঁকে, পাশে বাঁশের একটা লাঠি হেলান দেওয়া, বহুদিনের সঙ্গী। 'কলকাতা থেকে'—সহজ করে সে বলল, সোনারপুর-দমদম-বালিগঞ্জ ইত্যাদির ভিন্ন কোন মানে নেই এখানে। ততক্ষণে পাউরুটি কলা এসে গেছে, আধগ্লাস দুধও খেয়ে নেওয়া যায় স্বাস্থ্যের কথা ভাবলে। কলায় বেশ শিচ্ছিল করে, রুটি গলায় বেধে যায় না। 'এখানে কদিন থাকার মত একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে, কোন ঘর—?' দরকারী প্রশ্নটা ক'রে ফেলতেও ওদিকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেলনা; 'ঘর কোথায়—, ঘর-নেই।' ব'লে সে আবার চাদর ভাল ক'রে জড়িয়ে বসল। 'ঘর নেই'—হতে পারে না মনে মনে জেনে সুদীপ খাওয়ায় মন দিল।

স্টেশনটার নাম খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয় যা দেখে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে। তাছাড়া তেমন খেয়ালিপনা সত্যিই মনে জাগে না, ওটাও একরকম 'সুন্দর নাম দেখে নেমে পড়ব' প্রভৃতি থেকে হয় মনে হয়। মন কখনোই তেমন ফাঁকা স্লেট হয়ে থাকে না যে একটা স্টেশনের সুন্দর নাম নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত তৈরী করে দেবে, এমন সটান কিছু হয়না সহজে; নিজেকে যে কত ভাবেই ঠকানো হয়। শ-দেড়েক মাইলের মধ্যে এখানটায় জঙ্গল-পাহাড় অল্প অল্প থাকতে পারে মনে হয়েছিল ম্যাপ দেখে—তার বেশী কিছু না। হাতে কিছুটা সময় ছিল অল্প টাকাও। তাছাড়া সে দেখেছে শহরের একদিনের হাত খরচের চেয়ে এই ধরণের জায়গায় একটা গোটা দিনযাপনের খরচ বেশী নয়, এমনকি কম-ও। এছাড়া অজুহাতও আছে; শেষ-পরীক্ষার সময় একটা সার্ভে রিপোর্ট দেওয়ার কথা। প্রচলিত প্রথামতে কয়েকটা বইও পুরণো ছাত্রদের বর্ণনামত কি ধরনের হওয়া উচিত জেনে বানিয়ে লিখে দেওয়া যায়। 'উচিতার্থে বিধিলিঙ্'। কি দরকার? অতটা করতে ইচ্ছে করে না, এখান ওখান যাওয়া যখন হয়ই—। উৎপাদন প্রধান শস্যগড় আয়-পরিবারের আয়তন ইত্যাদি সম্বন্ধে বা এক কথায় দারিদ্র্যের বর্ণনা একটা তৈরী করলেই হয়। তাছাড়া 'এমনি এসেছি' বা 'বেড়াতে এসেছি' বললে এদের-ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, যে কোন আস্তানায় থাকা—সেথে 'কষ্ট করা' এইসব। আড়চোখে

ডাকায়, ঘুরে ঘুরে থাকে—আর প্রশ্ন করে। তার চেয়ে কোন অজুহাত থাকা ভাল, নিজের-ও—এদের-ও।

'এগুলো একটু রেখে যাচ্ছি' বলে বিছানা আর বড় ব্যাগটা রেখে শুধু কাঁধের ঝোলাটা নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়েই মনে পড়ে—পয়সা দিয়ে আসা হয়নি; থাক্—দোকানিও ডাকাডাকি করছেনা যখন, ফিরে এসে দেবে। মালপত্তর তো জামিন রইলই। ভাল ক'রে আড়মোড়া ভেঙে—দু'একবার একটু লাফিয়ে এজটা ঢিল তুলে গাছের গুঁড়ির দিকে ছোঁড়ে—ফস্‌কে যায় অবধারিত।

পলাশ-পলাশ, চারদিকে অজস্র পলাশ। পাতাঝরা-প্রায় ন্যাড়া, রুক্ষ-তেড়া-বাঁকা চেহারা। উই ঢিপি তার মাঝে। ছোট ছোট ঝোপ। ইতস্তত পিয়াল-মহুয়া আর শালের গাছ। বসতি সংলগ্ন কয়েকটা আম-কাঁঠাল ছাড়া প্রায় সব গাছ ন্যাড়া, হীম-ঠাণ্ডার প্রতীক্ষায় চুপ। লক্ষ্য করলে প্রায়ই দু'একটা গাছে কুঁড়ি আসবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি চলছে জোর, হঠাৎ বিস্ফোরণের মত ফুলে ফুলে ঢেকে যাবে। কিছুটা যেতেই বাঞ্ছিত দৃশ্য চোখে পড়ে; টিলার মত ছোট ছোট পাহাড় শুরু হয়েছে। প্রধান লোকালয় থেকে দূরে চলে এসেছে। ঘুরে ঘুরে আদিবাসীদের ছাড়া ছাড়া কয়েকটা বসতি দেখা যায়। একেক সঙ্গে কয়েকটা ক'রে বাড়ি, ফুল গাছ, মুরগী-শুয়োরের ঘর, ফুলগাছের সরু ডালে গালা পুষ্টু হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের অন্যতম অর্থকরি ফসল-গালা।...শতকের...থেকে এ অঞ্চলে গালার চাষ বিস্তার লাভ করে এবং—।'

ঢাল-টিলা-ঢিপি-তার ওপাশে ঢাল, শুকনো সোঁতা।

চারদিকে কেউ নেই,—কেউনা। এতক্ষণে সত্যি হাত-পা মেলা গেল। প্রায় রোমকূপ পর্যন্ত শিউরে ওঠা ভাললাগাটা অনুভব করা গেল। এমন স্ফূর্তিতে মানুষ গান ক'রে ওঠে। কিছুটা যেন উন্মুখ উত্তেজনার মত ধীরে হাঁটা যায় না, অন্যমনস্ক হলেই বেগ বেড়ে যায়। এমন সময় মনে হয় অনেক কিছু ক'রে ফেলা যায় যেন ক'রে ওঠা অসম্ভব নয়। ওইখানে দুর্গের চূড়া ওই টিলাটার আড়ালে। দুর্গের খুব জটিল দুরূহ পথ। কেউ ঢুকতে পারেনা। চূড়া থেকে দিগন্ত অবধি প্রাকার দেখা যায়। সমস্ত সময় মধ্যাহ্ন—ঝাঁ ঝাঁ রোদ। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ধূসর-ধূসর বাদামী রুক্ষ-সব। দুর্গের পাথর রোদে লাল, উত্তাপ ছড়াচ্ছে, তাপে সব দূরে সরে যায়। এমন টান টান হয়ে আছে প্রতিটি দেওয়াল হঠাৎ

জোরে একটা চীৎকার দিলে সব টলে চুড়মাড় হ'য়ে পরে যাবে, প্রখর রোদে-ধুলোয় অন্ধকার। উঁচু নীচু ঢালের ওপরই চাষবাসের চেষ্টা, জমি কোথাও রুক্ষ-পাথুরে, কোথাও উপত্যকায় উর্বর মোলায়েম মাটি।

উঁচুতে-ছোট্ট ফোঁকর দিয়ে আলো এসে পড়েছে। বাইরে বেরিয়ে দেখে এখনও কুয়াশা আছে তবে ঘরে ঘরে দোর খুলে গেছে, লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। এখন খুব সকাল, এত ভোরে কমই ওঠে। স্পষ্ট জোরালো ভোরের কাকলি—সিনেমার চেয়েও অবাস্তব মনে হয়। মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। রাত্রে খাওয়ার জন্যে ঘটিতে রেখে যাওয়া জল দিয়েই চোখ মুখ ধুয়ে এদিকের ছোট্ট চায়ের দোকানে গিয়ে দেখে খুলে গেছে। খদ্দেরও জড় হয়েছে কজন। রন্ধ্রে রন্ধ্রে চায়ের প্রচলন হয়ে গেছে, প্রত্যন্ত গ্রামেও।

থাকার জায়গা এ যাত্রা আশ্চর্য তাড়াতাড়ি পাওয়া গেছে। ছাদ জানলা দেওয়াল এবং কিছুটা পরিসর—এই সবই আছে। এদের দেওয়া খাটিয়া, নিজের মনে করে নিয়ে আসা মশারী ইত্যাদি মিলিয়ে ব্যবস্থা হয়ে গেছে, মশারী বাঁধার স্থান ও দড়ির দৈর্ঘ্য নির্ধারণেও। ঘন ও মিষ্টি চা বেশ লাগে শীতের সকালে। কাল এমন সময় কি একটু পরে ট্রেন থেকে নেমেছিল।

আরেক কাপ চা দিতে ব'লে কয়েকটা তেলে ভাজা নিয়ে চিবোতে থাকে সুদীপ, সঙ্গে মুড়ি। ইচ্ছে ক'রেই জামাপ্যান্ট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবী পরেছে, গায়ে চাদর। চোখে না পড়াই ভাল, যদিও পোষাকেই তা এড়ানো যায় না, বুঝতে পারে—তার হাঁটাচলা—ধরণধারণ সবই ভিন্ন, দূর থেকেই বোঝা যায় ভিন্‌দেশী।

এর পর একটু বেরোলে হয়, চারপাশটা ভাল ক'রে দেখা। এ গ্রামেই একটা কোথায় কামারশাল আছে ভাল ছুরি তৈরী হয়,—"কতো দূরে দূরে যায়, লণ্ডনেও যায়" একজন প্রৌঢ় কাল এই দোকানেই বিজ্ঞের মত বলেছিল। এক্ষুনি গিয়ে কি দেখবে—কামারশাল? দেখেছে তো আগে—নানা জায়গায় অনেক। এ জায়গাটা চিনতে হলে দেখতে হবে ঐ কামারশালটা—বা মন্দির?

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কে সেই কালকের পথেই চলে এসেছে। একদিনের চেনা, একবারের, তাতেই প্রিয়, অন্য পথগুলোর চেয়ে আপন মনে হয়। এটা কোন কাজের কথা হলোনা, কম সময়ে যতটা বেশী যতোটা ছড়িয়ে দেখা যায় সেটাই ভালো বা উচিৎ ছিল।

পলাশ গাছের জটলাটার পেছনে অনেকটা ঢালু পাড় নেমে গিয়ে এখনও

একটু জল-প্রধানতঃ কাদা-জমে আছে কাল খেয়ালই করিনি। হাঁটু অবধি ডুবে আছে—যদিও ঠিক মাঝ পুকুরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি, ঝুঁকে আছে, দু'হাত কাদায় জলে ডোবানো। পেট-জলের সমান্তরাল প্রায়। জলের উপর রোদ পড়ে পেটের পর্দায় চিত্তির নড়ছে। দেখতে পাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, যদিও মুখ-নাকে কাদা লাগা এড়াতে মুখ এদিকেই ফেরানো। "মাছ আছে?" চেঁচাতেই জল থেকে ধীরে একটা কাদা মাখা হাতের আঙুল তুলে ইশারায় শব্দ করতে বারণ করল। অনেকক্ষণ চুপচাপ। লোকটি-ও যে যেভাবে স্থির হয়ে আছে লোকে দেখলে অবাক হবে কিম্বা হবে না—এখানকার লোকেরা বুঝবে ব্যাপারটা। হঠাৎ সে খুব নড়ে উঠে দু'হাত ভর্তি নড়ন্ত কাদা পাড়ের দিকে ছুঁড়েই বকের মত পা তুলে তুলে সেদিকে দৌড়ল—বাঁদিকের পাড়ে। কাদার শুধু একটা অংশ তখন নড়ছে—বোঝা যাচ্ছে একটা মাছ—কি মাছ জানি না।—এক বিঘতের মত লম্বা। চারদিকে আজ কেমন কুয়াশা কুয়াশা—কম আলো। কুয়াশা ঠিক নয় আকাশে ঝাপ্‌সা মেঘ জমে আছে—রোদ ছায়ার তফাৎ বোঝা যাচ্ছে না। লোকটি মাছটার কাছে পৌঁছে দুহাতে চেপে ধরে হঠাৎ চকিত হয়ে উঁচু পাড়ের দিকে দৌড়তে চোখ পড়ল, উল্টো দিক থেকে আরো দুটি লোক প্রায় একই পোষাক—মাছ ধরার থালুই হাতে আসছিল, লোকটিকে দেখে বিশেষতঃ পালাতে দেখে তারাও দৌড়ল। আগের লোকটিকে উঁচু পাড় বেয়ে উঠতে হওয়ায় এরা সহজেই ওর নাগাল পেয়ে গেল। ওপারে দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা করছিল। এ-অবস্থাটা বুঝেও যেন থামতে পারছে না। খুব কাছে পৌঁছে তারপর হঠাৎ দিক বদলে পালাবার চেষ্টা করতে ওদের একজন অবলীলায় তার কোমর জাপ্‌টে ধরে শুইয়ে ফেলল। অপরজন তার হাত থেকে মাছটা কেড়ে নিয়ে পা দিয়ে পাসড়ে একটা ঠোক্কর দিল। এখান থেকে ওদের কথা বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ধৃত লোকটির চেঁচানি—"একটাই তো-একটাইতো ধরেছি," ইত্যাদি গোঙানি শোনা যাচ্ছে। প্রহার ঠিক পুরোদমে হচ্ছে—তা নয়। হাঁটু দিয়ে মাটিতে চেপে ধ'রে রাখা, মুঠি পাকিয়ে শাষানি—আর মাঝে মধ্যে দু' একটা গুঁতো, এই চলছে। কিছুক্ষণ আবার যেন বিশ্রাম বা অপেক্ষা। কতক্ষণ এভাবে চলবে। কিছু একটা করা উচিৎ ভেবে ওদের কাছে যেতে আসামী খুব অনুরোধের চোখে মুখের দিকে তাকাল—আর সে দুজন যেন প্রত্যক্ষ উপেক্ষা দেখানোর জন্যই বেশী ক'রে মারতে থাকল। "আরে, কি হচ্ছে কি?"

বলতে তারা শুধু বলল—"তুমি কি জানো?"—এমনকি 'আপনি' ও নয়। আসামীকে দেখে মনে হল সেও সত্যি সত্যি, অন্ততঃ তার দ্বারা, কোন প্রতিকার আশা করছেনা। তার হাত ও পা থেকে বাকি দুজনের গায়ে মুখে এখানে ওখানে কাদার ছোপ গাঢ় বর্ণ চামড়ার ওপর শুকিয়ে একটু দূর থেকে আজকের এই হাল্‌কা মেঘের দিনে সাদা সাদা দাগ মনে হচ্ছে। মুখেও এমনি এলোমেলো দাগ পড়ার অভিব্যক্তি বিশেষ বোঝা যাচ্ছেনা। বুঝতে পারে সরে দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। গায়ের জোরে পারবেনা। তাছাড়া আসামীটি সম্ভবতঃ সামাজিক ভাবে সে নিজে অন্যায় করেছে-এমনটাই বিশ্বাস করে—সাহায্য করতে আসবেনা। এখন পর্যন্ত তাকে খুব ধস্তাধস্তি বা বলপ্রয়োগ করতেও দেখা যায়নি। ও চিৎ হয়ে শুয়েই—বুকের ওপর তখনও একজনের হাঁটু চাপানো ও নিজের দুহাতে মাঝে মাঝে আচম্‌কা এসে পড়া চড় চাপ্‌টা সামলাতে সামলাতেই যেন কি একটা কথা চালাতে থাকে বাকি দুজনের সঙ্গে। মাঝে মাঝে হঠাৎ আঘাতে মুখ বিকৃত হয়ে যায়, তবে তা দ্রুত সামলে নিয়ে সেই আহত হবার—ব্যথা পাবার দোষ সংশোধন করে নেয়। তার বুকের ওপর থেকে শেষ পর্যন্ত হাঁটু তুলে নেওয়া হয় ও সে উঠে একা একা ওপারের দিকে হাঁটতে থাকে। এরা দুজন দাঁড়িয়ে আছে যেখানে ও লোকটি পড়েছিল তার দুপাশে। ওর চলা প্রথমে কিছুটা নড়বড়ে দেখায়, তা ক্রমশঃ ঠিক হয়ে যায়। তবে, হঠাৎ বকের মত পা তুলে তুলে কাদা ছেড়ে দৌড়নোর তৎপরতার বিন্দুমাত্রও নেই। শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়ায় স্বস্তি হয়। এরা যদি ওকে ধ'রে কাদায় ডুবিয়ে মেরেও ফেলতো তার কি করার থাকতো কে জানে! ভিড়ের মধ্যে এই দুজনকে সে সঠিক চিনিয়ে দিতে পারতো এমনও মনে হয়না। চেঁচালেও এখান থেকে কেউ শুনতে পাবে এমন আশা কম। কিন্তু ও লোকটি আবার ওদের ছেড়ে আসা খালুইটার দিকে যাচ্ছে কেন? ওটা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে সে তো জলের দিকেই এগোচ্ছে! বেশ খিদে পেয়ে গেছে, কিন্তু ব্যাপারটা কি হচ্ছে না দেখে যাবার মানে হয়না। ও কি শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পেরেছে একটা মাছ ধরার তুলনায় মারটা একটু বেশী হয়ে গেছে, তাই আরো কটা মাছ ধরা ওর পাওনা—? এ-লোক দুটিও পাড় বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে। পায়ে লেগে দু'একটা ঢেলা গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে নামে, এ লোকটি ততক্ষণে জল-কাদা ভাঙতে ভাঙতে হাঁটু জল পেরিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে ওদের দিকে তাকায় তার অস্তিত্ব একেবারে

অগ্রাহ্য ক'রে। ওরাও স্থির চেয়ে আছে। ও কিছুটা ইতস্তত: ক'রে জলে খালুই পাতে ও তার মধ্যে হাত ঢোকায়, তুলে একটু এগিয়ে আবার পাতে। কয়েক বার এমন হয়। সে ইতস্তত: হাঁটে ও কাদার মধ্যে খালুই চেপে ধরে তার মধ্যে হাত ঢোকায়। এ-দু'জন ক্রমশ পাড়ের মাটিতে শুকনো দেখে বসে পড়ে। গায়ে লেগে থাকা শুকনো কাদা খুঁজে খুঁজে ঝেড়ে ফেলে। পরস্পরের দেহে কাদার দাগ খুঁজে দেয়। একজন ট্যাঁক থেকে তামাক আর পাতা বার করে আরেকজনকেও দেয়। দুজনে দুটি পাকাতে থাকে। লোকটি বোধহয় এবার একটা মাছের স্পর্শ পায় খালুইয়ের ভিতর, হাতের চাপে মাছটাকে মেরে অগোচরে কাদায় পুঁতে ফেলতে চেষ্টা করে মনে হয়। কিন্তু তার ভঙ্গী ও নড়াচড়া সব প্রকাশ ক'রে দেয়। একজন উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি সব বলে। লোকটি যেন জানতোই এমন হবে। ক্লান্ত ভাবে খালুইয়ের ভিতর থেকে হাত বার করে ছোট একটা মাছ পাড়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়। পাড়ে পড়ে মাছটা অল্প অল্প লাফায়। দাঁড়িয়ে ওঠা লোকটি গিয়ে সেটাকে ধরে মাটিতে এক আছাড় দিয়ে কুড়িয়ে এনে পাশে রেখে বসে। ও লোকটি তখন জল ছেড়ে তাদের দিকে উঠে আসছে দেখে অপরজন শুধু উঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে মারের ভঙ্গী দেখায়। লোকটি আবার জলের দিকে ফিরে যায় ও এলোমেলো খালুই পাততে থাকে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নড়েচড়ে বেড়ানোর সময় সে ক্রমশঃ আর সোজা হয়ে দাঁড়ায়না, শুধু খালুইটা ঘাড়ের ওপর তুলে ধ'রে পা ফেলে। খালুইয়ের গা থেকে কাদা জল লোকটির সারা গায়ে গড়িয়ে পড়ে। বেলা বাড়তে থাকে। এইভাবে অনেকক্ষণ বাদ দিয়ে দিয়ে আরো কয়েকটা মাছ ধরা পড়ে। প্রত্যেকবারই লোকটা পাড়ের দিকে ফিরে আসতে চায় ও এরা তাকে আবার ফিরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে সুদীপের সন্দেহ হয় ডোবাটায় মাছ আর একটাও আছে কিনা। লোকটি ক্রমশঃ খালুই পাতার অজুহাতে তার ওপর দেহের ভর ছেড়ে দিয়ে ছোট ছোট বিশ্রামের অবকাশ করে নিতে চেষ্টা করে। তার ক্রমাগত হাঁটা চলায় ডোবাটার সমস্ত জল একটা গাঢ়-ঘন সবদন্ধ অবস্থা নিয়েছে। একবার পা ফস্‌কে বা ভারী হয়ে আসা ক্লান্তিতে বা শুয়ে পড়ার অনিবার্য বাসনায় লোকটি পড়ে যায় ও তার কাঁধ মুখ এবং মাথাও কাদার মধ্যে তলিয়ে যায়। ঘন হয়ে ওঠা জল খুব অল্পই নড়ে। লোকটা ধীরে ধীরে খালুইয়ের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার পা ফেলে। বেলা দ্রুত পড়তে থাকে। তার মধ্যে

এখন একটা যান্ত্রিক ভঙ্গী এসে গেছে চূড়ান্ত ক্লান্তির পর্যায়টা যেন পেরিয়ে এসেছে। এখন যেন সে বাকি দিন ও সমস্ত রাত এভাবে ঝুঁকে ঝুঁকে পরশ পাথর সন্ধান করতে পারে। এই লোকটির পড়ে যাওয়া উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি পাড়ের দুজন বোধহয় খেয়ালই করেনা। একসময় বোধয় রোদ পরে গেছে খেয়াল করে উঠে দাঁড়ায়, লোকটিকে হাঁক দিয়ে ডাকে—"অনেক হয়েছে এবার নিজের পুকুরে গিয়ে মাছ ধরো। "লোকটি প্রথমে যেন বুঝতে পারেনা—চেয়ে থাকে, হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে আবার খালুই পাততে যায় ও শেষে বুঝতে পেরে জলকাদা ঠেলে ঠেলে উঠে আসে। এরা দুজন চারপাঁচটা মাছ ও দেশলাই মাটি থেকে কুড়োয়। লোকটি খালুইটাকে একপাশে রেখে শুয়ে পড়ে, হাত পা মুহূর্তে শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে। ঈষৎ হাঁ করা মুখ একপাশে ফেরানো। সারা গা কোমরের গামছা, মাথা মুখে সমানভাবে কাদা মাখা। শুকনো কাদা মাটির রঙের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। কিছুটা ভিজে থাকায় রঙ কিছু গাঢ় দেখায়। একজন খালুইটা নিয়ে কাদা বাঁচিয়ে কাদা ধোয়ার চেষ্টা ক'রে। বিশেষ ফল হবেনা বুঝে ফিরে আসে। এরা যাবার উপক্রম ক'রে লোকটির দুপাশে দাঁড়ায়। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে আর কি হবে—সুধীশ মনে মনে ভাবে। সেই সকালে দোকানে খাওয়ার পর সারাদিনে আর কিছু খাওয়া হয়নি। খিদে পেয়ে পেয়ে মরে গেছে, পেটের মধ্যে অল্প চিন্‌চিন্ করছে, মুখে একটা তেতো স্বাদ। লোকটি এখন একই ভঙ্গীতে পড়ে আছে। গভীর শ্বাসে শুধু বুক ওঠা-নামা করে। একজন পা দিয়ে ঠেলে তাকে জাগাতে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে আত্মরক্ষার দুর্বল দুই হাত মাথার ওপর তোলে। একটা হাস্যকর ভঙ্গী হয়। এদের ইচ্ছে বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়ায়। ভিন্ন ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে। লোকটি খুব ধীর শ্লথ পায়ে তার পাশ দিয়েই চলে যায়। অল্প করে উঁচু পাড় বেয়ে উঠতে থাকে। লোকদুটি চলে যেতে যেতে একজন দাঁড়িয়ে কি মনে ক'রে দৌড়ে ফেরে। দ্বিতীয় জন-ও দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকটিকে যেখানে ধরে ফেলেছিল সেখানে গিয়ে সেই প্রথম মাছটা খুঁজে বার করে লোকটিকে চেঁচিয়ে ডাকে। লোকটি থামে, মুখে একটা হাল ছেড়ে দেওয়া নির্লিপ্ততা নিয়ে ফিরে তাকায় ও উঁচু পাড় দিয়েই হেঁটে হেঁটে তার কাছে যায়। ধস্তাধস্তিতে থ্যাৎলানো মুণ্ডহীন ও এতক্ষণে পিঁপড়ে ধ'রে যাওয়া মাছটা তার হাতে দিতেও মুখের ভাব একটুও পাল্টায়না, স্থির মাছটার দিকে চেয়ে থাকে যেন বুঝতে পারছেনা। একটা থ্যাৎলানো মাছ অতক্ষণ ধ'রে রেখারই বা কি থাকতে পারে। শেষে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে ফিরে হাঁটতে থাকে। ধীরে ধীরে ঢালের ওপাশে মিলিয়ে যায়। বাকি দুজনকে এখনও ওপাড়ের মাথায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্যের আলো একেবারে নেমে যেতে শুক্লপক্ষের চাঁদ কখন আলো ছড়াতে শুরু করেছে। জ্যোৎস্নায় নিথর ঘোলা জল আর চার পাশের শুকনো কাদা কেমন মায়াবী দেখায়।

আঠারো বছর বয়সের মৃত্যু

সমীর রক্ষিত

বিরাম একবার বিষ খেয়েছিল আঠারো বছর বয়েসে। একমাত্র এই বয়সেই কেউ জোরালো প্রেমে পড়তে পারে। একবার কুড়ি পেরিয়ে গেলে কেউ আর তেমন করে জীবনে প্রেমের মূল ওপড়ানো টান অনুভব করে না। আর মরতেও পারে না। স্বেচ্ছায় মরবার বয়েস বোধহয় কুড়ির নীচেই থাকে। তারপরেও অবশ্য মানুষ মরে কিন্তু সে মরাতে আর তার কোন হাত থাকে না। হয়তো ইচ্ছাও থাকে না। এই অনিচ্ছা মৃত্যুর মত বিরক্তিকর আর কী আছে?

আঠারো বছর বয়সের তাজা তরুণ বিরাম মরতে চেয়েছিল স্বেচ্ছায় কিন্তু মরতে পারেনি। খেয়েদেয়ে আর দশটা দিনের মতই সে নিজের ঘরে ঘুমতে গিয়েছিল। কিন্তু অন্যদিনের মত সে ঘুমোয়নি। হয়তো রাত জেগে জানলা দিয়ে গভীর নিস্তব্ধ আকাশের তারা দেখেছিল কিছুক্ষণ। তারপর একটি ছোট্ট চিরকুট লিখে বিষ খেয়েছিল। বাড়ির লোকেরা জানতে পারে ত্রিশ মিনিট পরেই, বিরামের গোঁ গোঁ শব্দে। তখনি তাকে হাসপাতালে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পাম্প করে তার পাকস্থলী সাফ করে দেওয়া হয়।

এই নিয়ে আমরা বিরামকে পরে অনেকদিন ঠাট্টা করেছি। গোড়াতে এ প্রসঙ্গ তুলতেই ভয় হত। কারণ বিরাম আগেও খুব কম কথা বলত, পরে তার কথাবার্তা আরো কমে যায়। তখন আমরা বরং অন্য কোন মুখরোচক উত্তেজনাময় প্রসঙ্গ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু কিছুদিন কেটে গেলে আমরা আস্তে আস্তে একটু আধটু আত্মহত্যার চেষ্টা নিয়ে বিরামকে ঠাট্টা করতুম। বিরাম হাসতো, গোড়াতে বলত—লিভ ইট। আরো কিছু দিন পরে বলত আত্মহত্যা করতে গাটস লাগে বুঝলি, কাপুরুষরা আত্মহত্যা করতে পারে না।

আমরা জানতুম কাপুরুষরাই আত্মহত্যা করে। আমরা যখন সেকথা বলতুম তখন বিরাম বেশ আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে বলত—নারে ঠিক উল্টো, সাহসী লোক ছাড়া কেউ আত্মহত্যা করতে পারে না। তোদের তো এব্যাপারে কোন একসপেরিয়েন্স নেই, আর আমি একসপেরিয়েন্স থেকে বলছি কাজেই তোদের কোন যুক্তিই ধোপে টেকে না। তা বটে। আমাদের কারুরই

আত্মহত্যার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র, তখন সবে কলেজে ফিজিক্স্ কেমেষ্ট্রির ল্যাবরেটরিতে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ করছি আর কলেজের বাইরে ক্রয়েড মার্কস পড়ছি। তখন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছুতে আমাদের বিশ্বাস নেই। ফলে আমাদের পিছু হটতে হল।

তবু অনুপ বলল—বড় বড় কথা বলিস না বীরু, তুই যে পাখির প্রেমে পড়েছিলি আর ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গালাগাল খেয়েছিলি এটা কী ঠিক না? ফ্রাষ্ট্রেটেড হয়ে তুই সুইসাইড করতে গিয়েছিলি তো, এটা কাপুরুষতা না?

বিরাম হো হো করে হেসে উঠেছিল। আমরা এতদিন শুধু ওর মুচকি হাসি দেখেছি। কিন্তু ও যে এত শব্দ করে হাসতে পারে জানতুম না। যেন একটা ছোট্ট ঝড় বইয়ে দিল বিরাম। হাসতে হাসতেও চোখে জল আসে, ওর দুচোখে জল এসে গেল। ও সে জল মুছল না। হাসি থামলে ও বলল—আচ্ছা অনুপ, তুই কখনো ফিল করেছিস প্রেম কী?

অনুপ সবচেয়ে স্মার্ট আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে, ও সঙ্গে সঙ্গে বলল—কেন করব না, যেকোন মেয়েকে দেখলেই আমার ভাল লাগে, প্রেমে পড়ে যাই।

—আমার কিন্তু পাখিকে ছাড়া আর কারোর দিকে চোখ তুলেও চাইতে ইচ্ছা করে না। বিরাম খুব সরল মুখে বলল।

—এতে কী প্রমাণ হয়? তুই পাখিকে সত্যিকারের মানে যাকে বলে যথার্থ ভালবাসিস? কে যেন বলেছিল হয়তো আমিই।

বিরাম খানিকক্ষণ একবারে চুপ করে থাকল। কোন কথা বলল না। তিস্তার পাড়ে উঁচু ঢিবির ওপর বসেছিলাম আমরা। তিস্তার বিরাট চরে কোথাও রোদ কোথাও ছায়া। ওপারে ধূসর গাছগাছালি। একটা বিরাট ক্যানভাসে মস্ত নিসর্গ ছবির মত নিস্তব্ধ, বিরাম যেন ওতে ডুবে রইল খানিকক্ষণ। আমরা খুব আস্তে হাসলাম ঠাট্টার হাসি। বিরাম বলল—ওতে কী প্রমাণ হয় আমি বলতে পারব না কিন্তু পাখি নেই অথচ আমি আছি এটা আমি ভাবতে ও পারি না।

—তাহলে তুই কী করবি, ও তো সুমিতের সঙ্গে লটকেছে?

বিরাম কোন উত্তর দিল না। শুধু এক এক করে সবাইকে দেখল। ওর সেই না-বড় না-ছোট চোখে, সে চোখের দৃষ্টিতে কোন দাহ কোন আক্ষেপ আছে বলে মনে হল না, কিন্তু উদাস থাকে বিষণ্ণও বলা যায় তেমনি।

কলেজ ছেড়ে আমরা একেকজন একেক দিকে ছিটকে পড়লাম, কেউ গেল এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে, কেউ ডাক্তারী, কেউ বি-এস-সি কেউ আবার সায়েন্স পাশ্টে বি-এ পড়তে লাগল। তারপর লেখাপড়ার পাট চুকলে সবার আগে বিয়ে করল বিরাম। বি-এ পাশ করেই। আমরা তিনজন এখন বিরামকে কাছাকাছি পাই—আমি অনুপ সুবীর। বাড়ির পছন্দ করা মেয়ে বিয়ে করে বিরাম বাবাও হল বিয়ের দেড় বছর পরে। সুবীরের দাদার সঙ্গে পাখির বিয়ে হয়েছে দুবছর আগে। আমরা এক বিজয়া দশমীর দিন জোর করে বিরামকে ধরে নিয়ে গেলাম সুবীরদের বাড়ী, পাখি এল মিষ্টি হাতে নিয়ে। পাখি হেসে বিরামকেই সবার আগে বলল—খান।

বিরাম লাজুক ছেলের মত বসেছিল, বলল—আমার গ্যাসট্রিক আমি কিছু খাব না। আমরা সবাই যেরকম হাসি হাসবার কথা তেমনি হাসলুম, বিরামকে খুব জোর করলুম অন্তত: একটা মিষ্টি খেতে। বিরাম একটাও কথা না বলে হাত গুটিয়ে বসে রইল। পাখি বলল—অন্তত: একটা মিষ্টি খান, আমি দিয়েছি।

কথাটায় কী যেন ছিল নয়তো আমরা সবাই একসঙ্গে এত জোরে হেসে উঠব কেন? বিরামের এরপর আরো গুটিয়ে যাবার কথা। ও কিন্তু এরপরে সত্যি সত্যিই একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে খেল।

পাখি খুব দ্রুত পায়ে ভেতরে চলে গেল, বলে গেল—আমি চা নিয়ে আসছি, বসুন। চা এল কিন্তু পাখি আর এল না। কেন কে জানে, চা নিয়ে এলো সুবীর নিজের হাতে। আমরা এলেবেলে অনেক কথা বললুম সময় কাটাবার জন্য, আমরা খুব উৎসুক হয়েছিলুম পাখি অন্তত: আরেকবার আসবে। আসলে আমরা মুখে যে যাই বলি না কেন পাখির ওপরে সবারই দুর্বলতা ছিল। পাখির রূপ ছিল। একটু লম্বাটে ফিগার, ভারী বুক, সরু কোমর, চঞ্চল চোখ—আসলে যা যা থাকলে উঠতি মেয়েদের জন্য নেশা ধরে তেমন সবকিছুই ছিল পাখির। পাখি ওর ডাক নাম, এই নামেই সবাই ওকে চিনত। ভাল নাম ছিল জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না সেকেলে নাম। নাম সেকেলে হলে কী হবে জ্যোৎস্না কী কখনো পুরনো হয়।

লক্ষ্মীপুর্ণিমার দিন আমরা তিস্তার পাড়ে গিয়ে চন্দ্রোদয় দেখব কথা, বিরাম এল না। সারাদিন ওর দশবার বমি পায়খানা হল। আমরা তিস্তার পাড়ে না গিয়ে ওর জন্য ডাক্তার ডাকাডাকি করলুম। সেই যে একবার বিষ খেয়ে

ছিল বিরাম তারপর থেকে ওর পেটের গোলমাল, ঘা টা হয়েছিল বোধহয়। এর দুবছর বাদেই ওর আলসার ধরা পড়ল।

মৃত্যু ব্যাপারটা সব সময়ই খুব নাটকীয়—সে আত্মহত্যার মৃত্যুই হোক আর রোগে ভুগেই মৃত্যু হোক। চল্লিশের আগেই বিরাম মরে গেল। তখন ওর বড় ছেলের বয়েস পাঁচ, তারপরের মেয়েটির বয়েস দুই। আমরা বিরামের বৌকে খুব একটা বেশী দেখিনি। বিরাম আমাদেরকে ওর বাড়িতে কখনো নিয়ে যেতে চাইত না। আমরাও বেশী পা করতুম না। ওর যৌ রুবি মফস্বলের মেয়ে বিরামের সঙ্গে বনিবনা হত না। ঝগড়া ঝাঁটি হত, অনুপ এসব খবর সংগ্রহ করত। বছরে ছমাস থাকত বাপের বাড়ীতে। অনুপ ঠাট্টা করে বলত—আচ্ছা বীরু, তোর এলোকেশী তো তোর কাছে থাকে না বললেই চলে তো পরপর তিনটে বাচ্চা বানিয়ে ফেললি কি করে?

বিরামের মেয়ের পরেও ছমাস আগে আরেকটি ছেলে হয়েছিল। অনুপ বিরামের বৌয়ের নাম দিয়েছিল এলোকেশী।

বিরাম খুব ভুগছে তখন। এ্যানিমিক চেহারা হলদেটে ছাপ মুখে, তবু খুব বীরের মত জোরালো হাসি হাসত। বিরাম বলত—আমি খুব হট বুঝলি। বেশী ষ্ট্রাগু করতে পারে না। তাই বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়।

—ভাখ ব্যাটা, তুই খুব বড়াই করতিস না পাখীকে তুই ভালবাসিস সেটা হচ্ছে যথার্থ প্রেম; এখন বৌয়ের সঙ্গে তো জোর জমেছে।

বিরাম খুব হাসত। সেই তিস্তার পাড়ে বসে প্রথম যেদিন খুব উঁচু গলায় ঝড়ের মত হেসেছিল তেমনি। পরে বিরাম এমনি প্রবল শব্দে হাসত, পরে ঝিমিয়ে পড়ত। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে বলত—আমি যদি সব চেয়ে কাউকে ঘৃণা করি সে আমার বৌকে। আমার সঙ্গে মারধোর হয়।

শেষবার অজ্ঞান অবস্থায় যখন ওকে হাসপাতালে দেওয়া হল তখন রুবি বাপের বাড়িতে। পরের দিন জ্ঞান ফিরলে আমরা বললুম—বীরু, তোর বৌকে নিয়ে আসি কী বল?

বিরাম অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অনির্দিষ্ট চোখে, যেন অন্য কিছু ভাবছে ও। কিছু বলল না, তারপর মাথা ঝাঁকাল—না দরকার নেই।

তারপর আমরা যখন উঠে আসছি, খুব ক্ষীণ গলায় বলল—তোরা কেউ গিয়ে আমার বড় ছেলেটাকে আনতে পারিস?

হাসপাতাল থেকেই আমি চলে গেলুম ওর শ্বশুর বাড়ি। বিকেলে রুবি ওর

ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফিরে এলুম। ততক্ষণে অনুপরা বিরামের ডেড বডি নিয়ে শ্মশানে চলে গেছে। শ্মশানে অনুপ সুবীর বিরামের বাড়ির লোকরা অপেক্ষা করছিল। রুবি কান্নাকাটি করল পাগলের মত তারপর অজ্ঞান হয়ে গেল। বিরামের বড় ছেলে বিরামের মুখে আগুণ দিল। পাঁচ বছরের ছেলে। শেষ পর্যন্ত শুধু পৃথিবীতে এই একটি প্রাণীকেই দেখতে চেয়েছিল বিরাম—পাখিকে নয়, নিজের স্ত্রীকেও নয়।

খুব সহজেই দাহ হয়ে গেল। বিরামের শরীরটা ছাই হতে খুব বেশী সময় লাগল না। আঠারো বছরে যে স্বেচ্ছায় মরতে চেয়েছিল আটত্রিশে সে শেষ পর্যন্ত রোগে ভুগে মরে গেল। পাখি এখন দুই সন্তানের জননী। বিরাম গেল তিনটি সন্তান রেখে। বিরাম মরল, পাখিও একদিন মরবে, আমরা যারা বিরামের বন্ধু তারাও একে একে চলে যাব। তবু আমরা সংসারী বন্ধুরা যখনই বহুদিন পরে একসঙ্গে হই পুজোতে বা কোন ছুটি ছাটায় তখন বিরামের কথা ওঠে; সবাই একবাক্যে বলি আঠারো বছর বয়েসেই বিরাম মরে গেলে ভাল হত। কেন বলি জানি না।

একালের গল্পকারদের একমাত্র ও নিজস্ব গল্পের ত্রৈমাসিক
বাংলাছোটগল্প

পরবর্তী সংখ্যা বেরুবে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৭

বিশেষ রচনা

এবার পুজোয় প্রকাশিত প্রায় একশটি গল্প ও আগেপিছের একশ জন গল্পকারকে নিয়ে তোলপাড় আলোচনা লিখছেন……

বিভিন্ন শারদীয় সংখ্যায় আপনি পড়েছেন এমন গল্প সম্পর্কে মতামত আপনিও পাঠাতে পারেন।

কার্যালয়: ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০

বেওয়ারিশ, আমি ও মৃতদেহের বিচার

জহর সেনগুপ্ত

আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই। বিশেষতঃ বিকেলে। আলসে পায়ে চৌমাথায় আসি। সঙ্গি সাথী খুঁজে বেড়াই। পাই না কাউকে। প্রণব তার বাবাকে দেখতে হাসপাতালে গেছে,—মন্টু বাঁদিকে চোখ ফেলে বলে,—চল আমরা কোথাও গিয়ে বসি। মন্টু বসতে চায় না। গাঁই গুই করে। 'ও, বুঝেছি—তপতী,' বলেই আমি হাঁটতে থাকি। আকাশে মেঘের ভার, চারদিক কালো-কুলো, কচ্ছপের পিঠ যেন, উবুর হয়ে আছে। গাছ পালার মাথায় মাথায় ঘুম ধরা স্তব্ধতা। রাগী মেয়ের মতো প্রকৃতি গোঁ ধরে আছে। আমার খারাপ লাগে না। অন্ততঃ এই এক ঘেয়েমি থেকে বাঁচা যাবে। পকেটে হাত রাখি। খুচরো পয়সা নেই। এক টাকার নোট একটা। সেটা ভাঙিয়ে সিগারেট কিনতে ইচ্ছে হয় না। উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে থাকি। এই রাস্তা দিয়ে এখন মলিনা যাবে। টুইশানী করতে বসাকদের বাড়ী। মনে হতেই পা সরে না। রাস্তায় পায়চারী করতে থাকি। মেয়েটা এখনও হাসতে পারে। কোন কিছুতেই দুঃখ নেই। একেকটা বয়সে অনেক কিছু তুচ্ছ মনে হয়। শুধু স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে। আমি হাঁটি হাঁটি হাঁটি না। লাইট পোস্টের গোড়ায় একটা লোম ওঠা কুকুর ঠ্যাং তুলে। ভাগ বলার আগেই মলিনাকে দেখতে পাই। ছাতা হাতে এগিয়ে আসছে। পায়ে পায়ে, যেন ঝুমুর বাজে। শরীরে একটা বাড়তি দোলা। দুলতে দুলতে এগিয়ে আসে সে। অপূর্ব দেখায়।—যাচ্ছো নাকি?—নাতো।—তাহলে কোথায় চল্লে?—'কেন 'টুইশানি' বলেই হেসে ফেলে সে।—সে কথাইতো জিজ্ঞেস করছি।—তাই বুঝি? ঠোঁট খুলে জিজ্ঞেস করে—আই-সি-আই'তে এপ্লাই করেছো? আমি মাথা ঝাঁকাই। ও আবার হাসে—এবার দেখো একটা কিছু।—যাও যাও, ছেলেমেয়ে পড়াওগে, বলে হাঁটতে থাকি। মলিনা হয়তো আমার পেছনে তাকিয়ে থাকে। আমার ভাল্লাগে না। এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে মলিনা জড়িয়ে থাকুক, এ আমার পছন্দ নয়। আসলে সে হয়তো বুঝতে পারে না।

মন খারাপ হলেই আমি শ্মশানে আসি। বৈরাগ্য নয়, কেমন একটা

ঝোঁকের মাথায়। চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকি। মাঝে মাঝে ভয় হয়। ভয় পেয়ে পেয়ে সাহস বাড়াই। মরার সাহস, বাঁচার সাহস। দশজনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখার শিক্ষা। মেঘে মেঘে আকাশ ঢাকা। হাওয়া বইছে, শিরশিরে হাওয়া। দূরের গাছগাছালির মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। দুই পাশে দু'টো চিতা, জ্বলছে। তাই শীত কম মনে হয়। দমকা বাতাস চিতার আগুন নিয়ে মাঝে মাঝে লুকোচুরি খেলছে। তার মধ্যে এক বুড়ি কী যেন খুঁজছে। কুড়িয়ে কুড়িয়ে বস্তায় ভরছে। ডান পাশের চিতার শববাহক অনাদশেক যুবক। শ্মশানের চাদ্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ওদের ছেঁড়া কথাবার্তা মাঝে মাঝে কানে আসছে। একটা চ্যাংড়া ছোকরা বুড়ির সংগ্রহ শালাটার ওপর হাত রাখল। এই বাপ্‌স্। মড়ার খুলি। অ্যাই বুড়ি, এ দিয়ে কি হবে? মানুষের যে অংশ পোড়ে না তা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে শ্মশানযাত্রীরা ধর্মের কাঁটা তোলে। বুড়ি সেই না—পোড়া অংশের টুকরো বস্তায় ভরে। ছোকরা ওর বস্তা ধরে টান মারলে বুড়ি বস্তাটাকে আঁকড়ে ধরে। বচসা শুরু হয়। ওর ফাঁকা দাঁতের তলায় কথা। ভাষা ভালো বোঝা যায় না। তাছাড়া ওদের সব কথাও কানে এসে পৌঁছায় না। ওদের দিকে এগিয়ে যাই। আরো অনেকেই জড়ো হয়েছে। এ যেন এক সুন্দর রগর। বুড়ি কান্নায় ভেঙে পড়ে। ওর না বোঝা কথা থেকে যা বোঝা যায় তা হোল ওই সংগ্রহশালাটাই ওর একমাত্র জীবিকা।

ওদের মধ্যে একজন চীৎকার করে ওঠে—কি কিচাইন্ করছিস? ছেড়ে দে। আমাদেরটা শেষ হয়ে এলো। জল ঢালতে হবে। বুড়িকে ছেড়ে সবাই চিতার দিকে এগিয়ে যায়। বল হরি—হরিবোল্। ওরা সবাই চলে গেল জল ঢালা চিতা থেকে ধুঁয়ো বেরোচ্ছে। এক সন্তাসী চিমটে দিয়ে ছাই ঘেঁটে এক টুকরো আগুন তোলে। গাঁজার কল্‌কেয় ভরে নেয়। বলহরি, হরিবোল—এইবার মিনমিনে গলা। একটা বাচ্চার লাশ। মাত্র একজন লোক বিড়বিড়িয়ে ধ্বনি দেয়। চাতালে শুইয়ে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যায়। শ্মশানের বাতিটা মিট্ মিট্ জ্বলছে। ওপাশটা অন্ধকার। একটা লাইটপোষ্ট সাক্ষী দেবতার মতো ঝিমোচ্ছে। গঙ্গার বুকে ঝপাং ঝপাং দাঁড় বাইবার আওয়াজ। আকাশের তারারা গা ঢাকা দিয়েছে মেঘের আড়ালে। চাঁদ শ্মশান থেকে দেখা যায় না। বৃষ্টি এবার জোরে আসবে। অন্ধকারে একটা টিনের শেড। তারি নীচে আশ্রয় নিলাম। বুড়ি মড়ার

খুলি খুঁজছে। বাচ্চা মড়াটা যে নিয়ে এসেছিল সে চলে গেছে। কেউ ওর কাছে নেই। সত্যি তবে কি ওটা বেওয়ারিশ। কার গোয়াল কে সামলায়? বেওয়ারিশ তুমি কার? এই বিশাল পৃথিবীতে কে তোমার? ক্রাইম্, ক্রাইম্—কে বলে? আমার ভেতরের কেউ কি?

পেছন ফিরতে দেখি ছাউনি থেকে ডানা ঝাপটে একটা শকুন উড়ে গেলো। দূর শালা। চোখ ঘুরাতেই দেখি বুড়িটা শীতে কাঁপছে। সদ্য নিভানো চিতার পাশে বসে হাত পা সেঁকে নিচ্ছে। ওর পেছনে সেই বেওয়ারিশ বাচ্চার লাশ। না, বাচ্চাটার কেউ ফিরে এলো না। বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে নামলো এবার। বুড়ি দৌড়ে পালাতে গিয়ে হোঁচট খায়। চাদ্দিকে তাকায়। ও জানে না, যে লাশটার পা ঠেকে গেলো সেটা বেওয়ারিশ। ভয় পেয়েছে বোধ হয়। বৃষ্টি এবার ঝমঝমিয়ে এলো। ওর চোখে সন্দেহ ফুটে ওঠে। চাদ্দিকে তাকায় আর বাচ্চাটার দিকে এগিয়ে যায়। ঝুঁকে পড়ে দেখে।।

আবার ঝোঁকে, আবার। বিদ্যুতের আলো ঝলসে ওঠে। জ্বলছে, নিভছে, আবার জ্বলছে, আবার নিভছে। বুড়ি ভিজছে, বেওয়ারিশ ভিজছে। কড়্ কড়্ আওয়াজ আবার বিদ্যুৎ। বুড়ি ঝপ করে বাচ্চাটার ওপর ঝুঁকে পড়ে। একি! ওর মাথাটা টান মেরে ছিঁড়ে বস্তার পুরে নেবে নাকি? আমার বুকের মধ্যে চিব চিব করছে। চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলি।

বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে বেওয়ারিশ যেন নড়ে উঠলো। ওকি তবে মরেনি? বুড়ির চোখ দু'টো অন্ধকারে জ্বলে ওঠে, বড় হয়। বাচ্চাটার বুকে কান পেতে কি যেন শুনতে চায়। তারপর তারপর……ঝুম্ ঝুম্ তোলপাড় বৃষ্টি। বেওয়ারিশের কাটা লাশ ভিজছে। বুড়ি ভিজে সপসপে। বুকে বেওয়ারিশের মাথা। চেপে ধরে ছুটে যায়। ও চাদ্দিকে তাকায়। কোথাও একটু আশ্রয় চায়। এ্যাইরে—এবার আমার দিকে চোখ পড়েছে। ছাউনির খোঁজ পেয়ে ওর চোখের তারায় হাসি ঝলকায়। এক হাতে সে মড়ার খুলি ভর্তি বস্তার মুখটা চেপে ধরলো। আরেক হাতে বুকে চেপে ধরা বেওয়ারিশের মাথা। বৃষ্টির ঝুম ঝুম আর বস্তার ঘসটানির খস খস খস। হঠাৎ সে আওয়াজ ভেদ করে আবার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে—ঠাঁ-ঠাঁ-ঠাঁ। শব্দ। একটা ক্রিজ শট্। বুড়ি—বস্তা—বেওয়ারিশ। আমার সারা গা জ্বলে যাচ্ছে। বাইরে অজস্র বৃষ্টি তবুও একটু জল পেতে বুকটা হা হা করে। শরীরটাকে টেনে টুনে ঝরে পড়া জলের ধারার কাছে নিতে চাইলাম। পারলাম না। না, আর না। আমি কিন্নু

জানি না। শুধু অন্ধকার—পাতলা, গাঢ়, দুর্ভেদ্য।

—কিস্‌সু জানি না হুজুর। কারা যেন কাদের বিচার করছে। তার মধ্যে আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায়। চোখের সামনে একটি শিশু কোলে তার মা হাপুস নয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর দিকে চোখ পড়তেই আমি চোখ নামিয়ে আনি। ঐ দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। আমি ওকে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। সামনের কাঠগড়ায় একজন লোক। অত্যন্ত স্বাভাবিক চোখে বিচারালয় দেখছে। আমার দিকেও বার কয়েক তাকাল। সে আমায় এতটুকু ভাবালো না। আমি ওকেও চিনতে পারি না। না চেনার জন্যই বোধহয় ও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ওই বুড়িটা? ভাঙা মেঘী গলায় কি বলছে?—একটা মড়ার দাম কি হুজুর? জ্যান্ত মানুষ অনেক দামী। মড়ার ব্যবসা করে একটা জ্যান্ত মানুষ যদি বাঁচতে চায়। চলে না হুজুর? চলে না? বুড়ির প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে থাকে আদালত জুড়ে। বিচারক মহাশয় তাঁর পরচুলায় গাম্ভীর্য আরো বাড়াতে চান। বার বার পরচুলা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন ছোঁড়েন—তারপর তুমি? আমি কিস্‌সু জানি না হুজুর। এইসব কিসস্থ বুঝি না।

চোখ খুলতেই মার মুখ। আমি হাসপাতালে। মা ঠোঁট নাড়াতেই দাদা বারণ করে—এখন কথা বলো না। বিদ্যুতের শক ব্রেণে এফেক্ট করে।

বাংলা ছোট গল্প

• বছরে চারটি সংখ্যা বেরুবে।

• যারা বছরের গ্রাহক হতে চান সাধারণ ডাক খরচ সহ সম্পাদকের নামে দশ টাকা পাঠিয়ে দেবেন।

• যারা লেখা পাঠাবেন, তারা লেখার সঙ্গে খাম বা ডাক টিকিট অবশ্যই দেবেন।

• উত্তরের জন্য কার্যালয়ে ছোটাছুটির প্রয়োজন নেই।

• প্রেরিত লেখা কখনই ফেরৎ দেওয়া হবে না।

কবিতা সিংহের গল্পের জগৎ

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

কবিতা সিংহের বৈশিষ্ট্য, কবিতা সিংহ মেয়ে। এরকম বৈশিষ্ট্য, কেউ কেউ বলতে পারেন, পৃথিবীর অনেকেরই আছে। একথা সত্য, পৃথিবীর হয়তো অর্ধেক মানুষই মেয়ে। তা হোক। কবিতা সিংহের মেয়ে হওয়ার বৈশিষ্ট্যই আমাদের আকৃষ্ট করতো, কেননা মেয়ে—গল্পলেখক আমাদের চোখে খুব একটা পড়ে না বাঙলাদেশে।

আমরা যখন খুব সন্দেহপ্রবণ ছিলাম, তখন বিশ্বাস করতাম না, বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলা আদৌ সম্ভব। সবাই গল্প বলেন, কিন্তু নিজের গল্প, অন্য লোকের মুখে বসিয়ে হয়তো। কিন্তু নিজেরই গল্প। অন্য লোকের মনের কথা জানা কী সম্ভব? তাই নিজের কথাই চরিত্রে চরিত্রে গল্পকার বসিয়ে দেন। ঘটনা হয়তো ঘটে, কিন্তু সেটা জানা যায় বাইরে থেকে। ধরা যাক, বিশ্ব-বিখ্যাত গল্পকার রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিখ্যাত গল্প কাবুলিওয়ালা। ওই গল্পে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা হয়তো বাইরে থেকে বর্ণনা দেওয়া যায়, কিন্তু কাবুলিওয়ালার মনের কথা রবীন্দ্রনাথ জানবেন কী করে? আসলে কাবুলিওয়ালার মনের কথা রবীন্দ্রনাথেরই মনের কথা। ইত্যাদি। একমাত্র ব্যতিক্রম ইংল্যাণ্ডের শেকস্‌পীয়ার। ওই ভদ্রলোকের সবগুলো চরিত্রই এত বিচিত্র, যে ধরা যায় না। কোন্ ভদ্রলোক শেকসপীয়ার। হ্যামলেট যদি শেকস্‌পীয়ার হন, তাহলে ওথেলোর পক্ষে শেকস্‌পীয়ার হওয়া সম্ভব নয়। তা যাক। শেকস্‌পীয়ারকে আমরা আদৌ মানুষ বলে গণ্য করি না। রবীন্দ্রনাথের ওইসব বালাই নেই। একটু খোঁচাখুঁচি করলেই, তার চরিত্রগুলো থেকে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসবেন। গোরাকে খোঁচালে রবীন্দ্রনাথ, কুমুদিনীকে খোঁচালে রবীন্দ্রনাথ, আবার চারাণবাবুকে খোঁচালেও রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনকে খোঁচালেও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পছন্দ বোঝা যায় গোরা কুমুদিনীকে দেখলে. অপছন্দ বোঝা যায় হারাণবাবু মধুসূদনকে দেখলে। সাহেবদের ভাষায়, যাকে বলে negative capability, সেই জিনিসটা একেবারেই কেতাবি, ও হয় না, শেকস্‌পীয়ার জাতীয় কিছু অমানুষকে বাদ দিলে।

এই জন্য, আমাদের সন্দেহপ্রবণতার সময়, আমরা কবির চাইতে

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গল্পকারকে বেশি দাম দিতাম। কবির ওইসব বালাই নেই, যা নিজের মনে আসে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে গেলেই হলো। কিন্তু গল্প বলতে গেলেই অপর ব্যক্তির মনের কথা টেনে বের করার ভান করতে হয়। বিশেষ করে পুরুষ হয়ে যে কীভাবে মেয়েদের মনের কথা জানা যায়, সেটা বোঝা আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য ছিল। শরৎচন্দ্রের মেয়েদের দেখে আমাদের আদৌ বিশ্বাস জন্মাত না যে রাজলক্ষ্মী বা বিজয়া বা রমা বাস্তব। ওরা শরৎচন্দ্রের কল্পনা। অবশ্য শরৎচন্দ্র পড়ে অনেক মেয়েই হয়তো রাজলক্ষ্মী, বিজয়া, রমা হওয়ার চেষ্টা করে, হয়তো হয়ও, তবে সে অন্য কথা। মোটমাট, কথা হচ্ছে, মেয়েদের মন যদি বুঝতে হয়, তাহলে মেয়েদের লেখাই পড়া দরকার। সেই জন্যই কথাটা পাড়া হয়েছিল, কবিতা সিংহের বৈশিষ্ট্য কবিতা সিংহ মেয়ে। অনেক মেয়ের কথা না জানতে পারলেও, অন্তত একটা মেয়ের কথা তো জানা যাবে।

সেই জন্য আমরা খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম কবিতা সিংহের গল্প উপন্যাসের জন্য।

কিন্তু আধুনিক সভ্যতার একটা অসুবিধে হচ্ছে এখনকার লোকেরা খুব বেশি পড়াশুনা করে। আর বেশি পড়াশুনা করলে মানুষের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। ওই পড়া জিনিসটার মতো হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা জন্মায়। সিণ্ডারেলার গল্পটা পড়া কবিতা সিংহের কাল হয়েছে। কবিতার মেয়েরা, তা যেমন তেমন হোক না, কেবলই ওই সিণ্ডারেলা হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। এ এক বিড়ম্বনা। ১১৩ পাতার উপন্যাসে (চারজন রাগী যুবতী, ১৩৮০) শেষ ২২ পাতা জুড়ে যদি সিণ্ডারেলা আর নায়িকার তুলনা পড়তে হয় তাহলে একজন রাগী পাঠক হয়ে ওঠা এমন আর বিচিত্র কি। শুধু সিণ্ডারেলার গল্প দিয়ে বোধ হয় ছোট গল্পই করা যায়, উপন্যাস তৈরি কি আর হয়। আর সব গল্পেই যদি নায়িকাদের ঘষলে সিণ্ডারেলা ফুটে বেরোয় (মধুহীন কোর না, দেশ ৮ আষাঢ় ১৩৬৯; খেলতে খেলতে একদিন, দেশ, ১৩ চৈত্র; পাপ পুণ্য পেরিয়ে উপন্যাসের বাসনা, শারদীয়া ১৩৭০ এর চতুষ্পর্ণায় প্রকাশিত উপন্যাস 'অথবা'র লাবণ্য, ইত্যাদি) তাহলে আমাদের ওই সন্দেহ আর ঘনই হয় যে, কবিতা সিংহ তাঁর সিণ্ডারেলার স্মৃতিই ঘুরে ফিরে গল্পে-উপন্যাসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছেন। সিণ্ডারেলা থেকে মায়ের স্মৃতি আর পরীর রাজ্য দূরে নয়। এই তিনটি মিলিয়ে নিন। সিণ্ডারেলা তার স্বপ্নের রাজপুত্রকে খোঁজে, পায়, কিন্তু

যাকে পায় তাকে রাজপুত্র মনে হয় না। এই কবিতা সিংহের সুরু, মধ্য ও শেষ।

যা বলছিলাম। মেয়েদের কথা পুরুষে বুঝতে পারে না, পুরুষের কথা মেয়েরা বুঝবে কেমন করে? তাই প্রয়োজনীয় রক্তদর্শন (বাংলা ছোটগল্প, শারদীয় ১৩৮১), তিনমুট ভালবাসা (?), বা সরমা উপন্যাস, বা পাপ পুণ্য পেরিয়ে উপন্যাসের সোমনাথের কথাবার্তা বা সেই উত্তম নায়কের জ্যোতিপ্রকাশ রায়ের কথাবার্তা আমাদের পড়ার কোনো দরকার নেই। ওসব নির্ঘাৎ ধার করা, অথবা মেয়েদের কল্পনা। সত্য নেই ওর মধ্যে। কবিতার গল্পে পুরুষ মেয়েদের খোঁজা যাক। সত্যমিথ্যা বোঝা খুব বেশি মুশকিল না।

'হঠাৎ সেই মুহূর্তে একটা ধোপভাঙা নিষ্কলঙ্ক সেমিজের জন্যে অপিমার সারা মনপ্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠল। (খেলতে খেলতে, একদিন)

এটা সত্য। অর্থাৎ সত্য বলেই তো আমাদের পুরুষদের মনে হচ্ছে।

'রবির জীবনে এমন সব ব্যাপার ঘটবে রবিই কি কোনদিন ভেবেছিল। একেবারে মেয়েছেলের মেয়েছেলের ছয়লাপ। যেমন চন্দনার সঙ্গে এক কায়দায়, তেমনি রত্নার সঙ্গে। আপিস পাড়ার ক্যানভাসার লিলির সঙ্গে, চৌরঙ্গির ফুটপাথের একটা দামী বেশ্যা জয়শ্রীর সঙ্গে এইসব ভালোবাসার কথার আদান-প্রদান করতে করতে হঠাৎ হঠাৎ রবির ভেতরটায় মেঘ ডাকার মতো গুরগুর শব্দ ওঠে। (তিনমুট ভালবাসা)

এটা সত্য না। পাঞ্জাব মেল জোরে ছোটে বলে কি আর এক ঘন্টায় হাওড়া থেকে অমৃতসর যাওয়া যায়।

'এই জন্যে তোকে এত শুকনো লাগে। ড্রাই। একস্‌প্রেশনলেস, সেক্সলেস। আমার বড় বৌদির মত। বিয়ের তিনবছর যেতে না যেতেই মোটা হয়ে গেল বড় বৌদি। ব্লাউজ পরত না। দাদার লাইফে কোনো ইন্টারেস্ট রইল না অফিস থেকে বাড়ি না এসে সোজা ব্রিজের আড্ডায় বসতে লাগল। (পাপ পুণ্য পেরিয়ে)

এটা মিথ্যা। ব্লাউজহীনতা থেকে ব্রিজমত্ততা বড়ো একরেখ হয়ে গেল না।

'দেহ শাসনের অত সব আশা সোটাও বেরোয় নি তখন। যার যেমন। হয় প্লেন, না হলে বেলুন। কোনো মাঝামাঝি নেই।

'আর শেফালিকা ইন্দিরাদের সময় সবই অত্যুক্তি।

'যে যতই ঢাকা-ঢে হোক না কেন, তা বলে চিৎ হয়ে শুলেও কারো কনট্যুর অমন পীনোন্নত হতে পারে?

'এ মেয়েটির শরীর কোনো ভাবেই তত বিকটও না, বিকশিতও না। বিকচ ?' (সেই উত্তম নায়ক, ১৩৮১)

এটা এতই ডাহা মিথ্যে, যে ভাষা সব গড়বড় হয়ে গেছে।

'তিন জন রোগী আর তিন বোতল মিকশার থাকলে যা হয় আর কি ? খাওয়া ভালো খাওয়া উচিত। এই ত খাচ্ছি কিন্তু কে আর বোতলের কাছে যায়, মুখ বাড়ায়। (মধুহীন কোর না)

এটা সত্যি।

'ঠিক তাই। মাটি করে গিয়েছিল। দ্বীপ তিনটে পেকড়ে আলগা। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিন্ন হচ্ছিল। স্বর্গ তারা পরিবর্তে পায় নি। বিশ্বামিত্রের মত অভিমানে নিজের স্বর্গ তৈরী করার মত প্রতিভা তাদের ছিল না। না তার চেয়ে তাদের উপমা দিই তিনটে জাহাজ দিয়ে। এক বন্দরে বাঁধা। কদিন আর ? ঝড় তো উঠবেই। জাহাজকে তখন ধর্ম রাখতে হবে। ভাসতে হবে। সকাল বেলাই কথা হয়েছিল কমলার বিবাহবার্ষিকীতে ওরা যাবে। ওদের নিয়মে। আপনাকে আগেই বলেছি দুজনের হ্যাঁ মানেই তিনজনের হ্যাঁ। তবে সন্ধ্যের দিকে তিনজনের সকালের হ্যাঁ কি করে না হয়ে গেল বলুন। কমলার বিবাহবার্ষিকী ওদের কাছে একটা অন্ত্যোপচার—

(মধুহীন কোর না)

এটা সত্যি হতে হতেও মিথ্যে হয়ে গেল, বেশি বই পড়ার ধান্ধায় প্রথমে দ্বীপ, তার পরে ঝড়, তার পরে অন্ত্যোপচার। ভাগ্যিস ড্যাশ এসে গিয়েছিল তারপর।

১৩৮৩ সালের সাহিত্যসংখ্যা দেশ পত্রিকায় কবিতা সিংহ তাঁর আত্মপরিচয় দিয়ে গুটিকয়েক কথা বলেছেন, সেগুলো ঝালিয়ে নেয়া যাক।

(১) তিনি বলেন, তিনি মাতৃতন্ত্রী। সম্ভবত তাঁর বক্তব্য, তিনি মাতৃ-শাসিত, মাতৃতন্ত্রে বড়ো হয়েছেন। মাতৃতন্ত্র ব্যাপারটা সামাজিক বিজ্ঞানে অন্য জিনিস, তবে তাঁর বক্তব্য মনে হচ্ছে : তাঁর শৈশবে তিনি মায়ের আওতায় বড়ো হয়েছেন।

তারপর তিনি বড়ো হয়েছেন, স্বামির ব্যুরোক্র্যাসীতে।

মা তাঁকে বলতেন : গল্প পাহাড় থেকে নেমে আসা ধ্বসের মতো। সে সব নিয়ে নেমে আসে। গাছ পাথর মানুষ মাটি।

স্বামী তাঁকে বলতেন ধমক দিয়ে : গল্প লিখতে গেলে কলম স্ট্যাণ্ড অ্যাট

ইজ হয়ে যায় কেন ?

আসলে কবিতার গল্প স্ট্যাণ্ড অ্যাট ইজ-ও নয়। একেবারে অ্যাটেনশন। বড়ো জড়, ধ্বসের গতি তো দূরের কথা, ঝর্ণার গতিও তাতে নেই। বরং তাঁর আত্মপরিচয়ের গল্প অনেক সাবলীল। গল্পে উপন্যাসে এই সহজ স্বাভাবিক ভাব অনুপস্থিত। তাছাড়া, তাঁর বাক্যগুলো দু-লাইনের বেশি চলে না। বড়ো বেশী থামে। বর্ণনা তাঁর লেখায় কম। ফলে আচ্ছন্নতা বা মগ্নতা যেমন তাঁর লেখায় ফোটে না, তেমনি ঝড়বৃষ্টির গতিশীলতাও তাঁর গল্পে আসে না।

(২) তাঁর লেখায় শৈশবস্মৃতি প্রবল। তাঁর লেখায় উৎস ক্রোধ এবং প্রতিবাদ। এটা তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কে ধারণা।

এটাই মাটি করেছে। দুটো কি মেলে ? এর ফলে যা হয়েছে তা হোলো, ক্রোধ ও প্রতিবাদ শৈশবের স্মৃতিতে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলো হয়েছে। শৈশবের মাধুর্য তিক্ত হয়েছে। আমরা যারা চারজন রাগী যুবতীতে রাগী যুবতী খুঁজতে গিয়েছিলাম, বা পাপপুণ্য পেরোনোর চেষ্টায় ছিলাম, তারা না রাগী, না যুবতী, না পাপ, না পুণ্য, কোন কিছুরই সন্ধান পাই নি।

(৩) কবিতা অনেক ইংরেজি পত্রিকায় লিখে এসেছেন। এটা আমাদের আদৌ পছন্দের নয়। বিশেষত তাঁর গল্পের বড়লোকরা যখন এখানে ওখানে ডে-স্পেণ্ড করে আসে, তাতে খুব মনে হয়, তাঁর ইংরেজি পত্রিকার সঙ্গীরা বিশেষ ভালো ছিল না।

(৪) 'আজ আমি নিজেকে সেইসব উদ্ভিদের মত বোধ করছি—যারা পরিমিত সূর্যালোক জল আর খাদ্যের পরোয়া করে না। এমন কি পুরুষ না পেলে আপনিই দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করে। ঈশ্বর আমি তাদের মত বাঁচতে শিখেছি। এর চেয়ে পবিত্রতা আমি চাই নে'। (পাপ পুণ্য পেরিয়ে)

এটা কোন্ ধরণের পবিত্রতা ? মায়ের অ্যারিস্টোক্র্যাসী বা স্বামীর বুরোক্র্যাসীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক্রোধ ভালো কথা, কিন্তু পার পাওয়ার কি ওই পথ ? এতে গ্লানি দৈন্যই ফোটে, ভালোবাসা তো আসে না। ভালোবাসা মানে অবশ্য 'সোমনাথের রক্তিম বুকে মুখ রাখা' বা 'নিরুপায় বিধবার আদঙ্গ লিপ্সার জ্বালায় জ্বলবার বেদনা' নয়। অথবা 'বুকের মাঝখানের তিলটি এ জন্মের মতো অচুম্বিত থাক—এটাই কি পবিত্রতা। কবিতা সিংহের অনেক নায়িকার বুকে তিল থাকে। চারজন রাগী যুবতী থেকে আমরা জানতে পারছি 'বক্ষমধ্যস্থ তিল কবিত্বের 'লক্ষণ'। হায় কবিত্ব কেন ফোটে না। আসলে কবিতা তো অ্যাক্টি

কবিত্ব। 'এমন কাগজ কলম নিয়ে বুকে বালিশ দিয়ে পূর্ণেন্দু পত্রীর ছবি সেই মৃণালের মত ভাবুক ভাবুক মুখ করে গোটাগোটা অক্ষরে কবিতা লিখছে ভাবতেই আমার কেমন হাসি পায়।' (চারজন রাগী যুবতী) তাহলে উপায় কী। কবিতাও হবো সিংহও হবো, কী প্রকারে ?

কবিতা সিংহ, আমাদের সন্দেহ, নিজেকে উজাড় করে লেখার চেষ্টা করেন না। রেখে ঢেকে বানিয়ে বানিয়ে সোনার কলমে নয়, কলম কাটিয়ে লেখা যাকে বলে, সেরকম লেখা কবে লিখবেন। না হলে আর আমাদের মেয়েদের মনের কথা জানা হয়ে উঠল না।

With Best Compliments from :

Shyam Sundar Suresh Kumar

9, Jagmohan Mallik Lane
Calcutta—7

অসভ্য

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

বীরেশ আসবে নাকি ?

চারুপ্রিয়র মুখে হঠাৎ বীরেশের নাম শুনে মৌরী চমকে উঠলো। বিব্রত হলো।

অফিস থেকে বাড়ি এসেই এভাবে কেউ কথা বলে ? কেন বীরেশ আসবে। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করার মতো একটা কথা হলো ?

চারুপ্রিয়র কথায় উত্তর দিতে ইচ্ছে হলো না মৌরীর। ভাবে, চারুপ্রিয় দিন দিন কি মোংরা অভদ্র হয়ে যাচ্ছে। অভো নেবে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে ওর ?

মৌরীর বলতে ইচ্ছে করছিল, বীরেশ কি আমাদের বাড়ি আসে, কখনো দেখেছ ?

বলতে গিয়ে বলতে পারলো না। মৌরীর তর্ক করতে ভালো লাগে না।

মৌরীর মনে পড়ে গেল। বীরেশ একবার এসেছিল। একদিন সন্ধ্যায়, কোন কাজে নয়। একেবারেই অকারণে।

কবে একবার হঠাৎ বাসে দেখা হয়েছিল, কথায় কথায় বীরেশ জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় থাকিস আজকাল ?

মৌরী হেসে বলেছিল, কোথায় আর, একটা বাড়িতে।

তা তো বুঝতেই পারছি, সে বাড়িটা কোথায়।

বালিগঞ্জ প্লেসে। বাড়ির নম্বরটাও বলেছিল।

বীরেশ বলেছিল, যাব একদিন তোর বাড়িতে। তোর সংসার দেখতে।

যাস, বলেছিল মৌরী। স্পষ্ট বলতে পারেনি, না বীরেশ যেও না। বাড়িতে যেও না। এমনি হঠাৎ কখনো দেখা হবে, এই ভালো। মুখে বলেছিল, তোকে জানি না, বলছি আর গেলি। এই তো কত বছর পরে দেখা।

না, দেখিস একদিন ঠিক যাব।

অত কষ্ট আর না করলি।

কষ্ট কি, তোকে দেখতে যাব। তোর বরকেও দেখে আসব।

মৌরী আর কিছু বলেনি, প্রতিবাদও করেনি। চুপ করে ছিল। ও জানে,

বীরেশ কখনো যাবে না।

বাসে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

তেমন করে তো যেতে বলছিস না! গেলে তোর কর্তা কি রাগ করবে?

মুখের ওপর কি বলা যায় সে কথা? কিছু না বলে মুখ টিপে হাসলো মৌরী। হাসিটাই ওর উত্তর। বীরেশ যা মনে করে করবে।

বীরেশ কথা রেখেছিল। একদিন সন্ধ্যায় সত্যিই এসে হাজির বালিগঞ্জ প্লেসে।

বীরেশ যখন এলো তখন চারুপ্রিয় বাড়ি ছিল না।

সন্ধ্যায় চারুপ্রিয় কখনো বাড়ি থাকে না। অফিস থেকে ফিরতে ওর রাত হয়। অনেক রাত। বড় সাহেবের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত থাকাটাই ওর এই বড় চাকরীর অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর বড় সাহেব রাত্রে অফিসের পর যেখানে যেখানে যায় চারুপ্রিয়কেও সেখানে যেতে হয়। বার হোটেল··· সর্বত্র। তারপর একসময় চারুপ্রিয়কে গাড়ি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, কখনো নিজে গাড়ি থামিয়ে দরজায় নামিয়ে দিয়ে যায়। দিন দিন চারুপ্রিয় চাকরী সর্বস্ব জীবন করে তুলছে। বসকে খুশি করতে করতে নিজেও ভেঙে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে। অন্য হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যা থেকে মৌরীর একা একাই কাটে। সমস্ত বাড়িটা ঝিমিয়ে থাকে। থম থম করে। একটা বাচ্চা থাকলেও বোধহয় অন্যরকম কাটতো। তা হলো না।

বীরেশকে দেখে যেমন অবাক হলো, তেমনি ভালো লাগলো মৌরীর।

বললো, আয় ভিতরে আয়, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন। ঘরের মধ্যে ডেকে নিল।

তুই তো কলেজ থেকে বেরিয়েই বিয়ে করলি। বিয়ে করে কেমন যেন মিইয়ে গেছিস।

মোটেই না।

মুখে প্রতিবাদ করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলো না মৌরী। হেসে বললো, এখানে বোস। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

মৌরীর এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসলো না বীরেশ। বললো, সারাদিন চেয়ারে বসতে হয়। তোদের নরম বিছানায় একটু পা তুলে বসি। বীরেশকে দেখে সেদিনও পুরণো বন্ধুদের কথা মনে হয়েছিল। আজ আবার সেই পুরণো হালভাঙা ছন্নছাড়া দুপুর সিকেসগুলি নেচে উঠলো বুকের মধ্যে। কয়টি মুহূর্তের

অন্ত। পুরণো দিনের গল্পে কোন ঘটনা নেই, থাকলেও তেমন কিছু নয় যা অপরিহার্য। অথচ যাদু আছে। সেই যাদু-স্পর্শে কয়েকটা ঘণ্টা দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল।

বীরেশকে কফি খাওয়াল। ফ্রিজে ডিম, এক ডিস টুকরো করা মাছ ছিল, গ্যাস জেলে ভেজে খাওয়াল।

বীরেশ বলছিল, দে আমাকে, আমি মাছ ভাজি। আমি ভালো রান্না করতে পারি। নিজেই তো রান্না করে খাই।

তোর রান্না তোর বাড়িতেই করিস। মাছ ভেজে আর রান্না দেখাতে হবে না।

রাত যখন দশটা, মৌরী বলেছিল, তোর রাত হয়ে যাচ্ছে না তো?

বীরেশ মৌরীর কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি। মৌরী ওকে উঠতেই বলেছিল।

চারুপ্রিয় যে কি ভাবে ফিরবে তা মনে মনে আন্দাজ করতে পারছিল মৌরী। চারুপ্রিয়কে কখনো দেখেনি বীরেশ, যে মূর্তিতে সে রাতে ফেরে তা বীরেশকে দেখানো তার ইচ্ছে নয়। এছাড়া আরো যে সব খারাপ দিকগুলি ভাবছিল মৌরী, ঠিক তাই ঘটে গেল।

চারুপ্রিয় যখন এলো, তখন রাত এগারটা। বীরেশ উঠি উঠি করেও ওঠেনি। মৌরীর সঙ্গে খাটের ওপর উঠে বসে গল্প করছিল।

দরজা বন্ধ ছিল। বেল বাজলো। মৌরী উঠে দরজা খুলে দিল। চারুপ্রিয় সোজা হেঁটে আসতে পারছিল না। পায়ে ব্যালান্স ছিল না। এ সময়ে যে চারুপ্রিয়র পায়ের ব্যালান্স চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে না, তা মৌরী জানে। এ সব দৃশ্য বীরেশকে দেখাবার ইচ্ছে ছিল না মৌরীর।

মৌরীর নিজস্ব জীবন যাপন সে কাউকে দেখাতে চায় না। কাউকে না। লোকে জানে মৌরী এখন খুব বড়লোক হয়ে গেছে। ওর স্বামী প্রচুর টাকা আয় করে। শুধু তাই জানুক। এর বেশি কিছু তাদের চোখে আঙুল দিয়ে মৌরী দেখাতে চায় না।

সেদিন চারুপ্রিয় খুব বোকার মতো একটা ভুল করে বসলো। ঘোলাটে চোখ টেনে মেলতে পারছিল না। ঠোঁটের কোনে হাসি বাঁধতে পারছিল না। ঠোঁট ঝুলে পড়ছিল। জিব আড়ষ্ট। বীরেশকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কে?

মৌরী সহজভাবে বলেছিল, বীরেশ, বীরেশ সান্যাল। আমরা এক সঙ্গে

পড়তাম, তোমাকে সেদিন বলেছিলাম।

হুঁ। চারুপ্রিয়র মুখ দিয়ে একটা মৃদু শব্দ বেরুল। মৌরী বুঝতে পারলো তার কোন কথাই চারুপ্রিয়র এখন মনে নেই।

বসেছিলেন তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন বলে।

এতোরাত পর্যন্ত আমার জন্যই বসিয়ে রেখেছ?

চারুপ্রিয় সহজভাবে কথা বলতে পারছে না। ভাষার শালীনতা হারিয়ে ফেলেছে। মৌরী লক্ষ্য করলো চারুপ্রিয়র মুখ থমথমে। নেশায় মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। মুখের রেখায় ঘৃণা অবিশ্বাস।

নেশা করলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না কেন? সামান্য ভদ্রতাবোধ লোপ পায় কেন? নেশায় যদি মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায় তাহলে চারুপ্রিয় এতো নেশা করে কেন?

চারুপ্রিয়র কথায় মৌরীর মাথা হেট হয়ে যায়।

বীরেশ অপদস্ত বোধ করছিল।

বীরেশ সেই মুহূর্তে ভেবে পায়নি তার কি কর্তব্য। কি বলবে একজন অসংযত মাতালকে। কি তাকে তাকে বোঝাবে যে সে কোন দরকারেই আসেনি।

নেহাৎ একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে একজন ভদ্রলোক যেভাবে আসে, এসে গল্প করে, গল্প করতে করতে রাত হয়ে যায়, তেমনি গল্পে গল্পে তার রাত হয়ে গিয়েছিল, এই সহজ কথাটা যাকে বোঝাবে তার তখন কোন জ্ঞানই ছিল না। কিংবা সে তার স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না বলেই সবকিছু ভুল চোখে দেখে।

বীরেশ একেবারে চুপ করে থাকা ঠিক নয় মনে করে বললো, না তেমন দরকার কিছু নয়। কখনো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি তাই, আমিই বসেছিলাম।

বীরেশ যা বলেছিল তার এক বর্ণও চারুপ্রিয়র কানে যায়নি। চারুপ্রিয় আরো ছোট করে ফেললো নিজেকে, বললো, আমি কি একটু আগে এসে পড়েছি আজ?

তুমি এসব কথা বলছো কেন বীরেশকে?

বীরেশ বোবা হয়ে তাকিয়ে রইল। আর কোন জবাব খুঁজে পেল না। লজ্জায় অপমানে পায়ের নিচে মিশে যেতে লাগলো। মৌরীর চোখে গোলাপী রঙ ছিল না, সে স্পষ্ট দেখতে পেল, বীরেশ দম বন্ধ হয়ে মরে যাচ্ছে।

মৌরী মুহূর্তে বীরেশকে ঘর থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এলো, বললো,চলে যাও। আর দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

চারুপ্রিয় এগিয়ে এসে বীরেশকে বললো, কিছু মনে করবেন না বীরেশবাবু, আসবেন, সন্ধ্যায় মৌরী একা থাকে তো, একা একা ওর ভালো লাগে না। আপনারা এলে ওর ভালো লাগে।

চারুপ্রিয়র কথা শুনতে বীরেশকে আর দাঁড়াতে দিল না মৌরী।

মৌরী শুধু তার বুকের মধ্যে হাজারবার ছি ছি শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল।

তারপর আর কোনদিন বালীগঞ্জ প্লেসের বাড়ির চৌকাঠ মাড়ায় নি বীরেশ।

চারুপ্রিয় কোন দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে না। আজ সন্ধ্যায় বাড়ি এসেই 'বীরেশ আসবে নাকি' জিজ্ঞাসা করায় বিব্রত বোধ করলো মৌরী, ক্ষুব্ধ হলো।

বীরেশ একদিনই এসেছিল।

নির্লিপ্ত উত্তর দিলে মৌরী। মৌরী জিজ্ঞেস করলো, আজ এতো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে কি ব্যাপার।

চারুপ্রিয় তাকায় মৌরীর চোখে। তারপর হেসে বলে, তোমাকে দেখতে এলাম। চলো নিচের ঘরে বসি। বলে চারুপ্রিয় দোতলার ঘরে না গিয়ে এক তলায় ওর নিজস্ব ড্রিংকসরুমে গিয়ে বসলো। আলমারি, ফ্রিজ খুলে গেলাস বোতল নিজের হাতে সব সাজিয়ে নিল টেবিলে।

দেয়ালের মধ্যে গুঁজে রাখা নীল বালব থেকে হাল্কা নীল আলো চুইয়ে পড়ছিল দেয়ালে দেয়ালে। মৌরীকে পাশের চেয়ারে বসালো।

বীরেশের প্রসংগ তোলায় মৌরীর খারাপ লাগছিল।

আজ আর কাউকে বাড়িতে ঢুকতে দেব না। কেউ এলে ফিরিয়ে দেবে।

মৌরী ভেবেছিল ক্ষীণ প্রতিবাদ করবে। এ সব কথার মানে কি ? কিন্তু কিছু বললো না। পুরনো বিশ্বাসকে খুঁচিয়ে ঘরের নীল আলো ফ্যাকাশে করে দিতে ইচ্ছে করলো না। চারুপ্রিয় সন্ধ্যায় সোজা বাড়ি ফিরেছে, ভালোই হয়েছে। নিজের চোখে দেখুক সব।

নিজের গেলাসে হুইস্কী ঢেলে নিয়ে মৌরীকে লেমন মিশিয়ে জিন দিল। মৌরীর ভাল লাগে না এ সব। চারুপ্রিয়কে সঙ্গ দেবার জন্যই পাশে বসেছে। যা বদরাগী হয়ে উঠেছে দিন দিন। খেতে না চাইলে হয়তো বা মুখে আসবে

বলে বসবে। মুখের কোন লাগাম নেই। তাছাড়া পেটে খানিকটা পড়লে তো আর কথাই নেই।

সেই রাতের পর বেশ কিছুদিন কথা কাটাকাটি হয়। চারুপ্রিয়র অনুরোধ রাখলো মৌরী। মৌরী ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে গেলাস মুখে তুললো। চারুপ্রিয় খুশি হলো মৌরী ওর কথা শুনছে দেখে। চারুপ্রিয় দুগেলাস শেষ করে সিগারেটে টান দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, বীরেশ আসে কেন, তোমাদের কলেজ তো ফুরিয়ে অনেকদিন গেছে।

একথা আবার কেন, বলতে পারো?

না এমনি।

এমনি নয়। তুমি কিছুতেই একটা সহজ ব্যাপার সহজে নিতে চাইছো না।

ও বাড়ি এলো কেন? পথে বাসে তোমার সঙ্গেই ওর দেখা হয় রোজ?

তোমাকে এসব কথা বলে কি আমি অপরাধ করেছি? ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক, সহজে কেন নিতে পারছো না? প্লিজ সহজ করে নাও।

চারুপ্রিয় এসব কথা আর কোনদিন তুলবেনা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল। আজকের সন্ধ্যেটা সে মেরে ফেলতে চায় না। নিজেই চুপ করে গেল।

চারুপ্রিয়র কথার সুর পাল্টে গেল। আবেগে টলমল করে উঠলো। চারুপ্রিয় মৌরীর গেলাসে জিন ঢালতে ঢালতে বললো, আর কোনদিন বলবো না। তুমিও আর কোনদিন ওদের বাড়ি আসতে বোলো না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। মাঝে মাঝে গেলাস জলের শব্দ। তোমার জন্ত কি এনেছি দেখো। বলে চারুপ্রিয় তার ব্যাগ খুলে একটা কাগজের প্যাকেট বার করলো। প্যাকেট ছিঁড়তেই হাল্কা নীল রঙের একটা সিল্কের শাড়ি ভাঁজ খুলে ছড়িয়ে পড়লো, খুলে যাওয়া শাড়িটা মৌরীর শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, দেখোতো কেমন হয়েছে? দেয়াল চুইয়ে আসা নীল শাড়ির রঙ আরো নীল হয়ে উঠলো।

মৌরী কাপড়টা দুহাতে ধরলো।

চারুপ্রিয় মৌরীকে নতুন শাড়িটা এখনি পড়তে বললো।

মৌরী চারুপ্রিয়র অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেনা। মৌরী দেখতে পেল চারুপ্রিয়র দুচোখের কোলে দেয়ালে নীল আলোর মতো দুঃখ জমাট বেঁধে আছে। শাড়িটা নিয়ে মৌরী পাশের ঘরে যাবার জন্ত চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

চারুপ্রিয় মৌরীর শাড়ির আঁচল টেনে ধরে। বলে, না অন্তঘরে গিয়ে নয়, এখানে তো আর কেউ নেই। আমার সামনে পড়ো। আমি দেখবো শাড়িটা পড়তে পড়তে তুমি কেমন সুন্দর হয়ে ওঠো।

চারুপ্রিয় তাকিয়ে দেখলো মৌরীকে, তারপর বললো, না তোমার ওই ব্লাউজ মোটেই মানাচ্ছে না নতুন শাড়ির সঙ্গে। আবার ব্যাগ খুলে আরেকটা ছোট প্যাকেট বার করে ছুঁড়ে দিল মৌরীকে। বললো, এটা পড়ো।

প্যাকেটটা লুফে নিয়ে মৌরী মুখ টিপে হাসলো। প্যাকেট খুলে দেখলো, শাড়ির সঙ্গে রঙ মেলানো একটা স্লীভলেস সিল্কের ব্লাউজ।

গায়ের জামা খুলে ফেলে মৌরী চারুপ্রিয়র সামনে দাঁড়িয়েই ব্লাউজটা পাল্টে নিল। চারুপ্রিয় তীক্ষ্ণ চোখে দেখলো মৌরীকে। চারুপ্রিয় দেখলো, নীল পদ্মবনে একটি শাদা গোলাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারুপ্রিয় উঠে মৌরীর ছাড়া জামা কাপড় দুহাতে গুটিয়ে দূরে শাদা চাদরে মোড়া খাটের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, চোখের সামনে ছাড়া কাপড় ছড়িয়ে থাকলে মেজাজটাই বিগড়ে যায়।

তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে এই শাড়িটায়। চারুপ্রিয় মৌরীর কাছে এগিয়ে গেল। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। এমন করে যেন কোনদিন সে দেখেনি মৌরীকে।

দাঁড়াও। পকেট থেকে রুমাল বার করে মৌরীর দুভুরুর মাঝখানের লাল টিপটা মুছে তুলে দিল।

একি! মৌরী আঁৎকে উঠলো। মৌরীর কাপানো ছাঁটা চুলগুলি ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। বললো বেশ লাগছে। এখন কুমারী কুমারী দেখাচ্ছে।

পকেট থেকে একটা শিশি বার করলো চারুপ্রিয়। শিশি থেকে স্প্রে করলো ইনটিমেট। মৌরীর শরীর শাড়ি ব্লাউজ ড্রিংকসরুম ইনটিমেট হয়ে উঠলো।

সিঁদুরের টিপটা না তুললে কি হতো?

যদি আমার জামায় দাগ লাগে।

মৌরী হাসে।

তোমাকে বিয়ের আগে কেমন দেখাতো মনে আছে? ওই আয়নায় গিয়ে দেখো।

মৌরী আয়নার সামনে দাঁড়াল না। বরং চারুপ্রিয়র চোখে চোখ রেখে কি যেন দেখার চেষ্টা করলো। বললো তুমি দেখলেই হবে।

চারুপ্রিয়কে দেখে আর ভাবে কি পাগল লোকটা একটু আগেও বীরেশের কথা তুলে খোঁচা দিয়েছে মৌরীকে। ও কি বীরেশকে ঈর্ষা করে!

চারুপ্রিয় নতুন শাড়ির সঙ্গে নতুন বোতল খোলে। মৌরীর গেলাসে ঢেলে দেয়। নিজের গেলাস উপচে পড়ে।

তোমার সঙ্গে বসে সারারাত এই বিশ্রী তেতো জলগুলো গিলতে পারবো না। আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুম পেলেই ওই খাট আছে। দুজনে চলে যাব ওখানে।

চারুপ্রিয়র দুচোখ নীল হয়ে ওঠে।

নীল আলোয় মৌরীকে রূপকথার পরীর মত লাগে চারুপ্রিয়র।

দুচোখ দিয়ে চারুপ্রিয় মৌরীকে স্পর্শ করে। মৌরীর শরীর কি নরম, ফুলের মতো হালকা। চারুপ্রিয়র চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে।

মৌরী চারুপ্রিয়র খুশিতে মাতাল হওয়া দেখে, উপভোগ করে।

চারুপ্রিয়র ভিতরে এমন একটা মানুষ যে এতদিন মরেছিল তা কোনদিন জানতেও পারে নি মৌরী। বিয়ের সময় মৌরীকে বাড়ির মেয়েরা বান্ধবীরা লবঙ্গ দিয়ে চন্দনের গুটি গুটি ফোটায় সাজিয়েছিল। তাদের খুশিমত মৌরী একটার পর একটা সাজের প্রলেপ শরীরে তুলে নিয়েছিল। আর মনে মনে ভয়ে বিস্ময়ে অপেক্ষা করেছিল এই অজানা অচেনা অপরিচিত মানুষটার জন্ত। কি জানি, মানুষটা কেমন চোখে দেখবে তাকে। যে স্বপ্ন নিয়ে সে আসছে, শেষ পর্যন্ত মৌরীকে দেখে তার আশা মিটবে তো? মৌরীরও সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল। মানুষটা আজ এমন করে ভালোবাসছে কেন, কতক্ষণ এমন থাকবে! আজ যেন সেই বিয়ের রাত। সেই ভয়ের দ্বিধার মুহূর্ত মৌরীর। সেই রাতের মুহূর্তগুলি ঝুরঝুর করে চোখের সামনে গুড়ো সোনার মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

শুভদৃষ্টির সময় মানুষটা গোগ্রাসে দুচোখে গিলে ফেলার মতো তাকিয়ে ছিল। মৌরী লজ্জায় চোখ খুলতে পারে নি। বান্ধবীরা সুরসুরি দিয়ে হাসিয়েছিল ওকে।

ফুলশয্যার রাতে ঘুমুতে দেয়নি মেয়েরা। অতো মেয়েদের মধ্যেও চারুপ্রিয় কাঙালের মতো তাকিয়েছিল মৌরীর দিকে। চারুপ্রিয়র সেই ক্ষুব্ধ আতুর কাঙাল চোখ দুটি আজ আবার দেখতে পেল নীল রঙের মধ্যে। মৌরী এই চোখ দুটি অনেক খুঁজেও আর দেখতে পায়নি। আজ দেখতে পেয়ে আহ্লাদে

ভয়ে শরীর শির শির করে উঠলো মৌরীর। মৌরীরও হারাই হারাই ভয় সমস্ত শরীরে। ভয় নীল আলোর বাইরে, ভয় নীল শাড়ির ভিতরের সামান্য রক্ত মাংসের মানুষটার।

চার দেয়ালের মধ্যে নীল আলো। খুশিতে ভরপুর চারুপ্রিয়। মৌরীর শরীর ভেজে তির তির করে ঘাম ছুটে বেরিয়ে আসছে। চারুপ্রিয় মৌরীকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ডান হাতে রুমাল দিয়ে ওর মুখ থেকে ঘামের বিন্দুগুলি মুছিয়ে দিল। মৌরী তার দু চোখের পাতায় সোনা জলের স্রোত ধরে রাখতে পারলো না। চারুপ্রিয়র কাঁধে মাথা রেখে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো, অসভ্য।

চল, তোমার ঘুম পেয়েছে। চারুপ্রিয় মৌরীকে জড়িয়ে ধরে খাটের দিকে এগিয়ে গেল।

With Best Compliments from :—

Consorama Lubricants

86K, Monoharpukur Road
Calcutta—700029

Phone : 47-9088
Gram : Lubtech

With Compliments from

West Bengal Paper Converters'
Co-operative Society Ltd.

115 Biplabi Rash Behari Bose Road
Calcutta 700 001

Phone No. 22-1576

ভাল রুটি তাজা রুটি
খেতে যদি চাও
রায় বাড়িতে নিমন্ত্রণ
দৌড়ে চলে যাও।

আপনাদের সেবায়

রায় ব্রাদার্স (বেকারী)

৯৩এ, কাশীপুর রোড
কলিকাতা—২

With Best Compliments from

M/s. Badri Prasad Premchandra
46 Kali Krishna Tagore Street
Calcutta-7

With best Compliments of :

MAHAKALI ELECTRIC STORES

Estd. 1939 Phone : 34-1062

Licensed Contractors of Govt. of W. Bengal
& Calcutta Corporation
Electrical & Mechanical Engineers
Office—4/5A Raja Ram Mohan Sarani,
Calcutta-700009

Showroom :
42, Premchand Boral Street
(on Raja Ram Mohan Sarani, Jn.) Calcutta-12

Workshop :
3/1B, Raja Ram Mohan Sarani,
Calcutta-700009

With best Compliments of :

Roy's Electric

(Govt. Licensed Contractor)
39/1/2B, Canal West Road
Calcutta—700004

Phone No. 55-5505

আসুন
আধুনিকতম সর্বপ্রকার
পোষাক ও বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ

যোগমায়া মার্কেট

৩৪ বিধান সরণী, কলকাতা-৯

(বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থল)

স্বদেশরঞ্জন দত্ত কর্তৃক ১৮ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ২০ হতে প্রকাশিত ও ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস ৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৯ হতে মুদ্রিত।

মিলে মিশে করি কাজ

শাখার আওতায় সিন্ধ্রী এবং নামরূপ কারখানা দুটি মোটামুটি ভাবে সার উৎপাদন করে চলেছে। এছাড়া আমদানীকৃত সার সহ ট্রম্বে কারখানার কিছু সার আপাততঃ মধ্যপ্রদেশের জন্য এবং গোরক্ষপুরের কারখানার কিছু সার বিহারের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এগিয়ে আসছে দুর্গাপুর সার কারখানা।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রনালয়ের অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ন্ত্রন বিধির আওতায় পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন স্বীকৃত সমবায় সংস্থা, অনুমোদিত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও ডিলারদের মাধ্যমে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা সার বণ্টন করেন। এর মধ্যে ৫০% বা ততোধিক পরিমান সার সরকারী সমবায় ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিপণন বিধিবদ্ধ।

সরকারের এই ব্যবস্থা ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আরো বড় কথা, এই সমন্বীকৃত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে সর্বত্র সমভাবে সার পৌঁছানর ব্যবস্থা সহজ হয়। তাই এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, কো-অপারেটিভ আর ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এই তিনের যৌথ প্রচেষ্টায় বিকেন্দ্রীভূত বিপণন ব্যবস্থা ছোট ছোট চাষি ভাইদের ও সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিকর্মে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ সহজ করে। পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের এই মিলিত কর্মসূচির মূল কথা, আমরা সর্বদা কৃষি মন্ত্রনালয় ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য দফতরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ভাব ও পরিকল্পনা আদান প্রদান করে কাজ করি। অধিক ফলন কার্যক্রমে রাজ্যসরকারগুলির সহযোগিতা আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ

পূর্ব্বাঞ্চল বিপণন শাখা

৪১, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৬

D. No. 45/76 BANGLA CHHOTOGALPO Re. 3·00
PUJA NUMBER, September 1976

ভেবে চিন্তে এক সঙ্গে কাজ করার এইতো সঠিক সময়

কলকাতা শহরেও চাই বিশ দফা কাজের প্রস্তুতি

ক লকাতা শহর সমগ্র দেশের অংশবিশেষ—এর উন্নতির অর্থ দেশের অগ্রগতি।
ল ক্ষ্য রাখুন রাস্তায় কলের মুখ যেন বন্ধ থাকে—কারণ জলের অপচয় পাপ।
কা জ করে যেতে হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে—এরই ফলশ্রুতি আগামী দিনের কলকাতা।
ড়াতাড়ি টিকা ও প্রতিষেধ গ্রহণ--মহামারী রুখতে পারে।
শ হরবাসীদের আরো সুবিধা দান—কলকাতা পুরসভার লক্ষ্য।
হ তশ্রী মহানগরের শ্রী ফিরিয়ে আনে—লিখনমুক্ত পরিষ্কার প্রাচীর গাত্র।
রে যারেষি নয় · সমন্বয় সাধন করে কর্মযজ্ঞে যোগ দিন।
ও রা, যারা খাদ্যে ভেজাল দেয়—তাদের শাস্তি বিধান করতে সহায়তা করুন।
চা লাকিরদ্বারা নয়—একমাত্র গঠনমূলক সমালোচনাই পুরসভাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ই তস্তুতঃ ময়লা ফেলবেন না—সকাল ৮ থেকে বিকেল ৩ টের মধ্যে।
বি দ্যুৎ জনগণের জন্য—বাতিস্তম্ভ থেকে তা চুরি করা জনগণের সম্পত্তি আত্মসাতের সামিল।

শ হরের উদ্যান ও বৃক্ষরাজি অবহেলার নয়—এরাই শহরের শ্বাসযন্ত্র।
দ ণ্ডনীয় অপরাধ—লোক চলাচলের জন্য তৈরী ফুটপাথ জবরদখল করা।
ফা রাক রেখে বাড়ী করুন—গৃহনির্মাণের নতুন নিয়মাবলী জেনে চলুন।
কা জ করার জন্য পুরসভাকে শক্তি যোগান—আপনাদের পুরকর নিয়মিত দিন।
জে দ ধরে কাটা ফল খাওয়া বন্ধ—রোগ এড়াতে পারবেন।
র ক্তবাহী শিরা উপশিরার মত এই শহরের রাস্তাগুলি—এদের রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্র স্রাবাগার ও থুথু ফেলার জায়গায় পরিণত করবেন না এই শহরকে।
স্থ পাকার জঞ্জাল, ধুলোময়লায় এই শহরের বাতাস আর গঙ্গার ঐতিহ্যকে কলুষিত করবেন না।

ভি ত্তিভূমি শিক্ষায় গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি—পুরসভার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬১টি, কেশ ১টি, নৈশ বিদ্যালয় ৯টি।

কলকাতার জীবনে কলকাতা পুরসভা